ষষ্ঠ অধ্যায়

অপরাপর উপন্যাসে বন্ধুত্ব

(১৯৫৭ খ্রিঃ পর্যন্ত)

উনিশ শতকের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ঔপন্যাসিক,বিশ শতকের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এবং কল্লোল গোষ্ঠীর বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছাড়াও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছে আরো বাস্তববাদী, হৃদয়বাদী মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ক উপন্যাস লেখক। বিশ শতকের ১৯০৩ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' সেই শতকের প্রারম্ভিক লগ্নের শ্রেষ্ঠ রচনা। রবীন্দ্রনাথের যুগেই শরৎচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন, দরদী মানবপ্রেমিক ঔপন্যাসিক রূপে বাংলার সাধারণ নর-নারীর বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সচল প্রবাহ চিত্রণের বৃহৎ দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে সাধারণ গ্রাম-বাংলার জনজীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। আবার ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে এক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব হয় যা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা তারাশঙ্কর থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। কিন্তু বাংলা উপন্যাস জগৎ শুধু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর বা কল্লোল গোষ্ঠীর ঔপন্যাসিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আছে আরো বাস্তববাদী, প্রকৃতিবাদী, রোমান্টিক, সামাজিক লেখক। এদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়,নরেন্দ্রনাথ দে, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, সতীনাথ ভাদুড়ী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, সুবোধ বসু, মনোজ বসু, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়,কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, চাণক্য সেন, প্রফুল্ল রায়, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু প্রমুখ থেকে শুরু করে মহিলা ঔপন্যাসিক সীতা দেবী, শান্তা দেবী, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক। এই ঔপন্যাসিকদের অনেকেই কাহিনিতে মানুষের জীবনসমস্যা, জটিলতা, বিপর্যয় প্রভৃতিকে প্রকাশ করেছেন, কেউ প্রকৃতি

তন্ময়তায় আবদ্ধ থেকে মানবের সঙ্গে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য হৃদয়জ যোগকে গভীর অনুভূতির রসে জারিত করে তুলতে চেয়েছেন। কেউ বা আবার সমকালীন যুগ-সংকট, যুগ-বিক্ষোভ বা সমকালের কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক অস্বস্থিকর পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে, তার বাস্তব দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সচল প্রবাহের অনুসরণ পূর্বের মতো এ সকল ঔপন্যাসিকের অনেক রচনাতেও মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের সামাজিক গণ্ডীর পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবনের নানা রহস্য, বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যেকার সহজ, সরল গতিবিধি বা জটিলতাও হয়েছে অনেক ঔপন্যাসিকের কাহিনির মুখ্য বিষয়। নর-নারীর চিরন্তন সম্পর্ক-যা প্রচলিত অর্থে প্রেম নামে পরিচিত, তার বহু বিচিত্র রূপায়ণও ঘটেছে। অনেকের রচনাতে একদিকে যেমন নগর জীবন কিংবা গ্রামীণ জীবন, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত জীবন ধরা পড়েছে, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক , রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের আবহে মানব জীবনের বাস্তবচিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ দে, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, রমাপদ চৌধুরী, মহাশ্বেতা দেবী, মনোজ বসু, চাণক্য সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকের রচনায় বাস্তবজীবন বা সমকালীন জীবন চেতনার প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে সময়ের পরিবর্তন বা যুগের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের বিষয় বা ভাবনার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। উনিশ শতকের উপন্যাসের কাহিনির বিষয় বা লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিশ শতকের ঔপন্যাসিকদের বিষয়গত ভাবনার বৈপরীত্য অবশ্যই আছে। দুই শতকের যুগপরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এছাড়া বিশ শতকের উপন্যাসে বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক বা নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কেরও প্রবেশ অবশ্যই ছিল। প্রেম বা অন্যান্য পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে উপন্যাসের কাহিনি এ শতকে প্রবলভাবে বর্ধিত ছিল। এর সঙ্গে সমকালীন বাস্তব অবস্থার প্রভাব বিশ শতকের উপন্যাসেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

বিশ শতকের উপন্যাসে মানবিক সম্পর্কের চিত্র রূপায়ণ লেখকদের রচনাতে প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। এবং এর পাশাপাশি বন্ধুত্ব এই শতকের অনেক ঔপন্যাসিকের রচনাতে ভীষণভাবে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, কল্লোল যুগের লেখকদের উপন্যাস ছাড়া আমাদের আলোচিত কালসীমার মধ্যে যে সব ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে বন্ধুত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, তাঁদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, নরেন্দ্রনাথ দে, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ থেকে নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ স্ত্রী ঔপন্যাসিকের নাম করা যেতে পারে। এদের কারো উপন্যাসের বন্ধুত্বে চিরন্তন মূল্যবোধের ছোঁয়া লক্ষ্য করা গেছে, কারো উপন্যাসে দেখা গেছে সম্পর্কের মূল্যবোধহীনতা। আবার কোনো উপন্যাসে প্রবৃত্তির প্রকোপ বা বিভিন্ন পরিস্থিতি (বিশেষত অর্থনৈতিক) বন্ধুত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। বন্ধুত্ব নির্মাণ করতে গিয়ে কোনো ঔপন্যাসিকের রচনায় প্রবৃত্তির ভয়াবহতা প্রতিফলিত হয়েছে। কিছু উপন্যাসে প্রেম আর বন্ধুত্বের সংঘাত প্রতিফলিত হয়েছে। সামাজিক জীবনের একটি সম্পর্কের চিরন্তন যে রূপ দেখতে পাওয়া যায়, তার প্রতিফলন ঘটেছে লেখকদের রচনায়। কিছুক্ষেত্রে রূপায়ণগত বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেছে। ভাবনাগত বিষয়েও স্বতন্ত্র মনোভাব দেখা গেছে। যুগ পটভূমি বা পরিস্থিতিও অনেক সময় সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বন্ধুত্বের চিত্রায়ণে কিছু ক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

বিশ শতকের প্রথম দিককার বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নিরুপমা দেবী সামাজিক বা পারিবারিক পটভূমিতে মানব জীবনচিত্র তুলে ধরার এক অন্যতম প্রধান শিল্পী ছিলেন। বাংলার সামাজিক বা পারিবারিক জীবনের গণ্ডীতে নর-নারীর যে বাস্তব সচল প্রবাহ আছে, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার যে বিচিত্র অনুভূতি আছে, সম্পর্কের যে অকৃত্রিম বন্ধনমালা আছে, এই সব বিষয় নিয়ে তাঁর উপন্যাস রচিত। নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের বিষয়, ভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি শরৎচন্দ্রের কথা আমাদের মনে করায়। নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে নারী এবং পুরুষ

চরিত্রের স্বতন্ত্র সত্তার পাশাপাশি মানব সম্পর্কের চিরন্তন আদর্শের রূপ প্রকাশিত। তিনি সামাজিক জীবন ছাড়া আর কোনো বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেননি। রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি তাঁর উপন্যাসের বিষয় নয়, তাঁর উপন্যাস একান্তই বাংলার সমাজজীবনের চলমান ছবি। সামাজিক জীবনের রূপকার হিসেবে নিরুপমা দেবীর দু-একটি উপন্যাসে বন্ধুত্বের চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই সামাজিক জীবনের এই সম্পর্কটিকে তিনি কোনোভাবে এড়িয়ে যেতে পারেননি। যে কোনো সামাজিক লেখকের রচনার এক বড় অবলম্বন হল বিবিধ মানবিক সম্পর্ক। সামাজিক লেখিকা রূপে নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে সম্পর্কের বৈচিত্র্যময় রূপ এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। প্রেম, বন্ধুত্ব, দাম্পত্য, মাতৃত্ব , বাৎসল্য প্রভৃতি সামাজিক পটের উপর প্রবাহিত প্রায় সকল সম্পর্কের উপস্থিতি ঘটেছে তাঁর উপন্যাসে। নিরুপমা দেবীর 'দিদি', 'শ্যামলী' প্রভৃতি উপন্যাসে বন্ধুত্ব এসেছে। 'দিদি'তে অমর-দেবেন, বা 'শ্যামলী'তে অনিল-শিশির বন্ধুত্ব তাঁর উপন্যাসের প্রধান বন্ধুত্ব সম্পর্ক। এই দুই উপন্যাসে বন্ধুত্ব সহজ, স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হয়েছে। তবে উপন্যাস দুটিতে যেহেতু নারী চরিত্র বা নারী-মর্যাদার প্রাধান্য বেশি, কাজেই অন্যান্য সম্পর্কের মতো বন্ধুত্ব পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রশস্ত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

নিরুপমা দেবীর 'দিদি' উপন্যাসে অমর ও দেবেনের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসে তিনি সম্পর্কটির আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, তবে কাহিনির মুখ্য বিষয় রূপে নয়। এখানে লেখিকা যে বিষয়কে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন, তা অমরের সঙ্গে চারু এবং সুরমার সম্পর্কের সরল এবং জটিল প্রবাহ। তাকে রূপ দিতে গিয়ে অমরের সঙ্গে দেবেনের সম্পর্কের ক্রমবিকাশ কাহিনিতে লক্ষ্য করা গেছে। কাহিনির সূত্রপাত এই সম্পর্কের হাত ধরে। বিশেষ এক উদ্দেশ্যের জন্য কাহিনিতে সম্পর্কটিকে টেনে আনা হয়েছে। উদ্দেশ্যটি হল অমরের সঙ্গে চারুর যোগাযোগ সাধনের পটভূমি তৈরি করা। অমর দেবেনের বাড়িতে বেড়াতে এসে চারুর সঙ্গে পরিচিত হয় এবং পরে চারুর সঙ্গে তার বিবাহ

সাধিত হয়। অমরের সঙ্গে চারুর বিবাহের পরেই দেবেনও কাহিনি থেকে প্রায় উধাও হয়ে যায়। ঘটনার প্রবাহ যায় অমর, চারু এবং সুরমার পারস্পরিক জীবনকেন্দ্রে। নিরুপমা দেবীর 'দিদি' তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এখানে সামাজিক জীবনের বন্ধন ব্যাকুলতা বা তার আকর্ষণের চিত্র মুখ্য। তবে তার প্রসার হয়েছে মূলত দাম্পত্য-বন্ধন (চারু-অমর) ও বৃহত্তর পারিবারিক বন্ধনের (সুরমার অমরের পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধ বা ভালোবাসা) আঙিনায়। অমর-দেবেন সম্পর্ক কাহিনির প্রথমে একটা সম্ভাবনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেও, পরে তা গুরুত্ব হারিয়েছে। আবার লেখিকার পরবর্তী উপন্যাস 'শ্যামলী'তেও ভেসে আসা সম্পর্কগুলির মধ্যে অনিল-শিশির সম্পর্কের জায়গাটি খানিকটা প্রশস্ত। দুই চরিত্রই যথার্থ মানবিক। নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে সামাজিক সম্পর্কগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক আদর্শ, পবিত্র বা সামাজিক মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। তাঁর উপন্যাসে যেমন আছে আদর্শ স্বামী, স্নেহপরায়ণা মাতা, পতিব্রতা স্ত্রী, মাতৃভক্ত সন্তান, তেমনি আছে আদর্শ বন্ধু। 'শ্যামলী' উপন্যাসে আদর্শ বন্ধু রূপে উঠে এসেছে অনিল এবং শিশির, এই দুই চরিত্র। সামাজিক জীবনে এক সুস্থ, মধুর বন্ধনই সকলের কাছে কাম্য। আবার যে কোনো সম্পর্কের প্রবাহ বা গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় রসায়ন হল তার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না হলে সেই সম্পর্কের প্রবাহ বা আসল রহস্যকে বোঝা যাবে না। এর মধ্য দিয়ে সম্পর্কে ফুটে ওঠে সুন্দর বা কুৎসিত আবহটি। 'শ্যামলী'তে অনিল এবং শিশিরের সম্পর্ক এক পবিত্র, সুন্দর ভাবধারায় সিক্ত। বাস্তব জীবনে একটি সম্পর্কের মধ্যে যে মধুর, হৃদ্যভাব থাকা উচিত, তা অনিল-শিশিরের সম্পর্কে অবস্থিত। কাহিনিতে তারা এক আদর্শের মানদণ্ডে পারস্পরিক সাহায্য, সহানুভূতি, সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে সম্পর্কটিকে এক উন্নততর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। অনিল বিয়ে করতে এসে বাড়ির মনোনীত পাত্রীকে বিবাহ করতে না পেরে যখন মেয়ের বাবার চক্রান্তে কালা, বোবা, কন্যা শ্যামলীকে অজান্তে বিয়ের মন্ত্রে স্ত্রীরূপে মেনে নেয় তখন তার পূর্বের ঠিক হওয়া পাত্রী শ্যামলীরই ভগিনী বিজলীর নারীত্ব রক্ষার্থে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব সে শিশিরকে দেয় আর

তাতে শিশিরের সাড়া দেওয়ার মধ্যে বন্ধুত্বের এক মহৎ চিত্র প্রকাশিত। শিশির এক কর্তব্যপরায়ণ, উপকারী বন্ধুর মতোই অনিলের ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক জীবনে সর্বদা সাহায্য, সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আর পাশাপাশি অনিলও দিয়েছে বন্ধুকে তার অকৃত্রিম হৃদয়ের পরশ। একটি সমবয়স্ক, আশৈশব বন্ধুত্বের মধ্যে যে হৃদ্য-গভীরতা থাকা দরকার, তা দেখা গেছে অনিল-শিশিরের সম্পর্কে। তবে সম্পর্কটির প্রসার কাহিনিতে স্বল্প। কাহিনির শেষদিকে সম্পর্কটির যোগসূত্রটি প্রায় ছিন্নই হয়েছে। তবে তা সম্পর্কের বিনাশ নয়, নানা ঘটনার স্রোতে সম্পর্কটি তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কাহিনিতে বন্ধুত্ব সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক মহৎ ভাবের প্রকাশক। নিরুপমা দেবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'বিধিলিপি'তেও দেখতে পাওয়া যায় মহেন্দ্র এবং নিরঞ্জনের মধ্যে বন্ধুত্ব।তবে সেখানেও সম্পর্কটির ক্রমবিকাশ অত্যন্ত কম। কাহিনিতে বন্ধু মহেন্দ্রর প্রতি নিরঞ্জনের একটা টান বা আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেছে। সম্পর্করূপে বন্ধুত্ব কাহিনিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি।

তিরিশের দশকের মাঝামাঝি কাল থেকে উপন্যাস সাহিত্যে বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ। পেশায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক। বনফুল প্রায় ৪৫ বছর ধরে সাহিত্যচর্চায় রত ছিলেন। তিনি প্রায় ৪০টির মতো উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস, সামাজিক নানা ঘটনা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে গড়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসের কলেবর। কথাসাহিত্যিকদের সাহিত্যের এক বড় আশ্রয় হল অভিজ্ঞতা, জীবনকে দেখার অনুভূতি, সমাজকে গভীরভাবে জানার ব্যকুলতা। বনফুলের ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছিল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে। বিষয়বৈচিত্র্য ছিল তাঁর উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বনফুলের উপন্যাসে মানবিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যময় রূপ বেশি প্রতিফলিত হয়নি। 'রাত্রি', 'দ্বৈরথ', 'ভূবনসোম' প্রভৃতি উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর মানবিক সম্পর্কের নানা ঘাত-প্রতিঘাতময় রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। বনফুলের যে দু-চারটি উপন্যাসে

বন্ধুত্ব সম্পর্কের প্রবেশ ঘটেছে, তাদের মধ্যে 'জঙ্গম', 'নবদিগন্ত', 'দ্বৈরথ', 'পঞ্চপর্ব', 'নঞতৎপুরুষ' প্রভৃতির নাম করা যায়। তবে বনফুলের উপন্যাসে বন্ধুত্ব কাহিনির এক প্রধান সম্পর্করূপে আত্মপ্রকাশ করেনি। প্রায় উপন্যাসে তা একটি গৌণ সম্পর্করূপে স্থান পেয়েছে। বন্ধুত্ব তাঁর উপন্যাসে বিশেষ দিক নির্দেশক নয়। 'দ্বৈরথ' বা 'নবদিগন্ত' উপন্যাসের মতো দু-একটি উপন্যাসে কাহিনির প্রধান দুই চরিত্রের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেলেও, সেখানে সম্পর্কের প্রসার বা কার্যকারিতা বা গুরুত্ব খুব কম। 'দ্বৈরথ'-এ চন্দ্রকান্ত এবং গঙ্গাগোবিন্দ বা 'নবদিগন্তে' কিরণ ও দিবস – এরা প্রত্যেকেই কাহিনির প্রধান চরিত্র। উভয়ের সম্পর্কও বন্ধুত্বের, কিন্তু উভয়ের সম্পর্কের বিশেষ প্রসার নেই। বনফুলের নিজস্ব জীবনের দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে তাঁর জীবন ছিল বন্ধুবহুল এবং বন্ধুবাৎসল্য ছিল তাঁর জীবনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর সাহিত্য জীবনের একটি অন্যতম প্রধান অবলম্বন। তিনি ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাহিনিতে কাজে লাগিয়েছিলেন। তবে এ সম্পর্কটি নির্মাণে বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর উপন্যাসে এ সম্পর্কটির তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। তিনি যে কয়েকটি উপন্যাসে এ সম্পর্কটিকে তুলে এনেছিলেন, ঘটনাধারার বিবর্তনে বা বিশেষ কোনো ভাবের সূচকরূপে বা পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতায় তার খুব বেশি জায়গা নেই। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের বন্ধুদের মতো তাঁর কিছু উপন্যাসে দু-একজন বন্ধুর মধ্যে কবিত্বগুণ লক্ষ্য করা গেছে।

বনফুলের 'দ্বৈরথ' উপন্যাসটি মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর স্থাপিত একই সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যেকার পারস্পরিক আকর্ষণ এবং দ্বন্দ্বের কাহিনি। প্রধান দুই চরিত্র উগ্রমোহন এবং চন্দ্রকান্তের মধ্যে বিপরীতধর্মী মনোভাবের প্রবাহে এর কাহিনির প্রসার। মানব চরিত্রের মধ্যে রয়েছে এক রহস্যময়তা। প্রবৃত্তির রন্ধ্রপথ দিয়ে সেখানে মাঝে মাঝে প্রবেশ করে জটিলস্রোত। কাহিনিতে চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহনের মধ্যে বনফুল এরকম এক ভাবের প্রবেশ ঘটিয়ে তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনির গতি সচল রেখেছেন। চন্দ্রকান্ত

এবং উগ্রমোহন – উভয়েই জমিদার পাশাপাশি তারা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। সম্বন্ধী ও ভগ্নীপতির সম্পর্ক তাদের। অথচ কাহিনির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারা পরস্পর বিরোধ বা শত্রুতার মধ্যেই নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। এই উপন্যাসের বিষয় নির্মাণে বনফুলের দেখা এক বাস্তব জমিদারের প্রভাব পড়েছে। উগ্রমোহনের যে চরিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন, এইরূপ বাস্তব এক জমিদারকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন পিতার সঙ্গে বিহারের এক জমিদার বাড়ীতে গিয়ে। এবং সেখানে সেই জমিদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বাস্তব ছায়া পড়েছে উপন্যাসে।[১] সেই সঙ্গে কিছু কল্পনা মিশিয়ে 'দ্বৈরথ' হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের প্রথম সার্থক উপন্যাস।

'দ্বৈরথ' উপন্যাসে কাহিনির অন্যতম প্রধান চরিত্র চন্দ্রকান্তের সঙ্গে গৌণ চরিত্র গঙ্গাগোবিন্দের বন্ধুত্বের পরিচয় আছে। উভয়ে একসঙ্গে পাঠশালায় পড়েছিলেন। বোঝা যায় উভয়ের সম্পর্ক সমবয়স্কতার। তবে বন্ধুত্বের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মনের মিল। তাহলে সামাজিক অবস্থা বা জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির উর্ধ্বে উঠে ব্যক্তি-ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বন্ধুত্ব। কাহিনিতে এমন হৃদয়গত মিল বা সম অনুভূতির জন্য গড়ে উঠেছে জমিদার চন্দ্রকান্তের সঙ্গে গরীব গঙ্গগোবিন্দের সম্পর্ক। এবং তা নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। বনফুলের উপন্যাসে বন্ধুদের মধ্যে এক শৈল্পিক বা সাহিত্যিক সত্তা বাস করে। এই উপন্যাসে চন্দ্রকান্তের মধ্যে তা লক্ষ্য করা গেছে। সঙ্গীতের প্রতি তার নিদারুণ ঝোঁক। তবে গঙ্গাগোবিন্দের জীবন সাধারণ এক দুঃখী মানবজীবনের মতো। তবে এখানে চন্দ্রকান্ত এবং গঙ্গাগোবিন্দের মধ্যে বন্ধুত্বের উল্লেখ থাকলেও কাহিনির মধ্যে সম্পর্কটির পরিপূর্ণতা এবং প্রসার বিশেষ নেই। এই উপন্যাসের মূল বিষয় চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহনের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। এবং লেখক এখানে চন্দ্রকান্ত-গঙ্গাগোবিন্দের সম্পর্কের জন্য বিশেষ জায়গা রাখেননি। চন্দ্রকান্তের ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে মূলত উগ্রমোহন চরিত্রকে কেন্দ্র করে আর গঙ্গাগোবিন্দের যাবতীয় ভাবনার আধার হয়ে দাড়িয়েছে তার দুই কন্যা রুমনি ও ঝুমনি এবং

তার বাল্যকালের খেলার সাথী, বন্ধু চন্দ্রকান্ত ভগ্নি বহ্নিকুমারী। উগ্রমোহনের মতো বিশাল সিংহপুরুষ বা চন্দ্রকান্তের মতো সঙ্গীতপ্রেমী, মার্জিত বুদ্ধিসম্পন্ন, মহৎ, হৃদয়বান চরিত্র গঙ্গাগোবিন্দ নয়। এই দুই চরিত্রের পাশে সে চাপা পড়ে গেছে। বনফুল উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্তকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিতে গিয়ে এই চরিত্রটিকে অনেকটাই আড়াল করে রেখেছেন। ঠিক মতো প্রকাশ করেননি। আর তাই চন্দ্রকান্তের সঙ্গে যুক্ত তার সম্পর্কটির প্রসার বা গুরুত্ব অনেক ম্লান হয়ে গেছে। লেখক কাহিনিতে চন্দ্রকান্ত এবং গঙ্গাগোবিন্দ-এই দুই চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের পাশাপাশি অকৃত্রিম হৃদয়-অন্তরঙ্গতার দুই বিপরীতধর্মী চিত্রের অবতারণা করেছেন। 'দ্বৈরথ' শব্দের অর্থ দুই রথারোহীর মধ্যে যুদ্ধ। কাহিনিতে এই দুই মহারথী হলেন দুই জমিদার উগ্রমোহন এবং চন্দ্রকান্ত। আর তাদের মধ্যে লড়াই বা বিবাদই হল কাহিনির আসল বিষয়বস্তু। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই প্রতিফলিত হয়েছে। গঙ্গাগোবিন্দ এই দুই চরিত্রের বিবাদের মধ্যে এসেছে। স্বাভাবিকভাবে তাই চন্দ্রকান্তের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টিও এসেছে। কিন্তু কাহিনির ঘটনাধারার পথে উভয়ের সম্পর্ক বেশি জায়গা পায়নি।

তিনখণ্ডে রচিত 'জঙ্গম' বনফুলের সর্ববৃহৎ উপন্যাস। ত্রিশ দশকের কলকাতার নাগরিক জীবনের রূপ এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রচুর চরিত্র, ছোট-ছোট ঘটনা দিয়ে সাজানো 'জঙ্গম' বনফুলের এক স্বতন্ত্র রচনা। আর একটি বিষয় হল জঙ্গমের মধ্যে যে বিচিত্র এবং অদ্ভুত চরিত্র ও ঘটনা রয়েছে, প্রায় সবকিছুই তিনি বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং তাঁর মতে এই সকল বিচিত্র মানুষের জীবন অনুভূতি জঙ্গম উপন্যাসের মুখ্য বিষয় রূপে স্থান পেয়েছে।[২] জঙ্গম উপন্যাসের মতো সম্ভবত বনফুলের আর কোনো উপন্যাসে অধিক সংখ্যায় মানবচরিত্রের আবির্ভাব ঘটেনি। এখানে চরিত্র বেশি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে সম্পর্কের প্রাদুর্ভাবও বেশি ঘটেছে এবং পাশাপাশি কাহিনির মধ্যে বন্ধুত্বের উপস্থিতি দেখা গেছে। এখানে প্রধান চরিত্র শঙ্করকে কেন্দ্র করে উৎপল এবং ভন্টুকে নিয়ে যে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়েছে, সেই দুটি সম্পর্কই উপন্যাসটির প্রধান বন্ধুত্ব সম্পর্ক। অর্থাৎ শঙ্কর-উৎপল এবং শঙ্কর-ভন্টুর

বন্ধুত্ব। তবে প্রসারের দিক দিয়ে শঙ্কর-ভন্টুর সম্পর্কটির গুরুত্ব কাহিনিতে তুলনামূলক বেশি। কাহিনির সূত্রপাত ঘটেছে উৎপল এবং শঙ্করের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে উৎপল সাময়িক বিদায় হয়ে যায়, ফলে এই সম্পর্কটি কাহিনিতে তার গতি হারিয়ে ফেলে। পরে ভন্টু কাহিনির বিভিন্ন চরিত্র বা কিছু ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে দিয়ে শঙ্করের সঙ্গে সম্পর্কের যোগাযোগ স্থাপন করে, বন্ধুত্বকে কিছুটা গতিদান করেছে। এই উপন্যাসে তেমন সুসংহত কাহিনি নেই, যাকে ঘিরে বিভিন্ন চরিত্রের সুসংহত বিবর্তন ঘটবে। মানব জীবনের অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অনুভূতির আদান-প্রদান বা চোখে না পড়ার মতো বিষয়ের সংমিশ্রনে উপন্যাসটি নির্মিত। এর ঘটনা, চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ- প্রায় সবগুলিই অসংলগ্ন, এলোমেলো। শঙ্কর-উৎপল, বা শঙ্কর-ভন্টু সম্পর্কের বিবর্তনেও এই দৃশ্য আমাদের চোখে পড়বে। এখানে শঙ্কর প্রধান চরিত্র আর ভন্টু বা উৎপল অপ্রধান চরিত্র। এখানে সম্পর্কের বিবর্তনে একটি সুসংহত কাহিনি বা সামাজিক ভাবময়তার প্রবেশ নেই। কাহিনিতে শুধু তাদের জীবনের ছোটো-ছোটো ঘটনাকে নিয়ে অসংহত রূপরেখা তেরি করেছেন লেখক। 'জঙ্গম' উপন্যাসে বন্ধুত্বে এক বিশেষ দিক হল যে এখানে বনফুল তাঁর বাস্তব এক বন্ধুর ছায়ায় কাহিনির ভন্টু চরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন। কলেজ জীবনের বন্ধু শিবদাস বসু মল্লিকের উপন্যাস নাম হলো ভন্টু। লেখক নিজে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন – "আমারই এক বন্ধু ছিল, সে এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত নাম এবং শব্দ ব্যবহার করত।"[৩] এই উপন্যাসে ভন্টুকে বিচিত্র শব্দ করতে, বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন নামে ডাকতে শোনা গেছে। যেমন বাবাকে সে ডাকে 'বাকু' বা 'লর্ড বাকল্যান্ড' নামে। মেয়েদের ডাকে 'মোল্লা' বলে। অফিসের ছোটবাবু তার কাছে 'প্যানথার' আবার মৃন্ময়কে সে ডাকে 'মোমবাতি' বলে। এই উপন্যাসে ভন্টু যেমন লেখকের দেখা এক বন্ধুর প্রতিরূপ, তেমনি শঙ্কর চরিত্রটিও কিছুটা না কি তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু সজনীকান্ত দাসের আদর্শে গঠিত।[৪] সুতরাং বন্ধুবহুল বনফুলের জীবনের বাস্তব দু-একজন বন্ধু উঠে এসেছে উপন্যাসের পাতায়, অনেকটা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মতো। তবে 'জঙ্গম'-এ লেখক বনফুল নিজে কোনো বন্ধুরূপে আত্মপ্রকাশ করেননি। তাঁর

নিজের বন্ধুর ছায়া দিয়ে তৈরি করেছেন কাহিনির বন্ধু চরিত্রকে।তবে কাহিনিতে সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভাব বা উল্লেখযোগ্য ঘটনার স্রোত নেই। দুই বন্ধু উভয়ের পারস্পরিক জীবনে ফেলতে পারেনি বৃহৎ ছাপ বা কোনো সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

'নবদিগন্ত' বনফুল উপন্যাস সারণীতে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস না হলেও মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি এখানে প্রতিফলিত। বনফুল সাধারণত উপন্যাসে কল্পনা বা বাস্তব ভাববর্জিত বা কাব্যময় বিষয়বস্তু গ্রহণ করতে চাইতেন না। এই উপন্যাসে তিনি সেটা করেছেন। এই উপন্যাসে নায়ক দিবসের যে জীবনকে কাহিনির মূল বিষয় রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে বাস্তবভাবের পরশ খুবই কম। উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি দিবসের আদর্শ, চিন্তাভাবনা বা মতবাদ সাধারণ বাস্তব মানবের চিন্তার গণ্ডীতে পড়ে না। বরং তার পাশে বন্ধু রূপে অনেকটাই বাস্তবধর্মী চরিত্র হল কিরণ। উপন্যাসে এই দুই চরিত্রের বন্ধুত্বে বনফুল মনস্তাত্ত্বিক এবং কিছুটা কাব্যিক ভাবের প্রবেশ ঘটিয়েছেন। ফলে উভয়ের সম্পর্কে বাস্তব ভাবময়তার পরশ কম লক্ষ্য করা গেছে। কলেজ জীবন থেকে গড়ে ওঠা সমবয়স্কতার বন্ধুত্ব তাদের। এই উপন্যাসে কিরণ-দিবস সম্পর্ক ছাড়াও আরো দু-একটি বন্ধুত্ব সম্পর্ক এসেছে যেমন সূর্যকান্ত ও গোবিন্দ স্যাণ্ডালের সম্পর্ক। তবে মুখ্য কিরণ-দিবসের সম্পর্ক। দিবস এই উপন্যাসের নায়ক বা কেন্দ্রিয় চরিত্র। তার পাশে কিরণ সমভাবে উজ্জ্বল না হলেও অন্যতম এক প্রধান চরিত্র তো বটেই। লেখক এই দুই চরিত্রের সম্পর্কের ক্রমবিকাশে মনস্তত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন বেশি। সামাজিকভাব বা বিভিন্ন কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে তার প্রসার দেননি। দুই চরিত্রের আদর্শগত পার্থক্য অনেকটা, যেমনটা ছিল 'গোরা' উপন্যাসের গোরা-বিনয়ের মধ্যে। তাই বলে দিবস বা কিরণ কোনোভাবেই গোরা বা বিনয় নয়। গোরার মতো প্রখর ব্যক্তিত্ব কিরণ বা দিবসের নেই। তবে তাদের মধ্যে কোনো-কোনো স্থানে যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে বা দু-একটি তর্ক-বিতর্কের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেছে, তার নিরিখে কিছুটা হলেও বৈশিষ্ট্যগত মিল

চোখে পড়েছে গোরা-বিনয়ের সঙ্গে। অথচ প্রভাবের দিক দিয়ে গোরা-বিনয়ের সম্পর্কের এক আসনে বসার যোগ্য নয় দিবস-কিরণের সম্পর্কটি। উপন্যাসে দুই চরিত্রের স্বতন্ত্র জীবন লক্ষ্য করা যায়, তবে সেখানে বন্ধুত্বের প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। বরং সে তুলনায় অনেক বেশি গভীর বা কার্যকরী সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় সূর্যকান্ত-গোবিন্দর বন্ধুত্বের মধ্যে। গোবিন্দর মধ্যে বন্ধুপ্রীতির পাশাপাশি বন্ধুকৃত্য করার মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে। কিরণ-দিবস সম্পর্কের মধ্যে সেই দৃশ্য অবর্তমান। তবে কিরণের দিক থেকে কিছুটা হলেও বন্ধুপ্রীতি বা কর্তব্যবোধের ভাবনা দেখা গেছে। দিবস সেই তুলনায় অনেকটাই স্থির, নির্লিপ্ত। 'নবদিগন্ত' উপন্যাসের কাহিনি নায়ক চরিত্র দিবসকে ঘিরেই। তার সঙ্গে পিতা সূর্যকান্ত চৌধুরীর আদর্শগত সংঘাত। দিবসের কাছে সামাজিক সম্পর্ক বড় হয়ে দেখা দেয়নি। সে বাবার স্নেহবাৎসল্য, রঙ্গনার ভালোবাসা বা কিরণের বন্ধুত্বকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। প্রাধান্য দিতে চেয়েছে নিজ আদর্শ বা চিন্তাভাবনাকে।

বনফুলের উপন্যাসের বিষয়বস্তু অনেকখানি স্বতন্ত্র বা অভিনবত্বের পরিচয় বহন করে। পারিবারিক সম্পর্কের ঘেরাটোপে বিষয়বস্তুর সংযোজন তাঁর অনেক উপন্যাসেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেখানে চলমান সামাজিক বাস্তবতার চেয়ে, অতুচ্ছ ভাবের পরশ প্রবাহিত। বনফুলের উপন্যাসের বন্ধুত্বের সামাজিক সাধারণ ভাবটি কম। তাঁর উপন্যাসের বন্ধুরা কেউ কবি, কেউ অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন আদর্শবাদী যেমন দিবস শঙ্কর প্রভৃতি। সম্পর্কের মধ্যেকার যে সহজ, সরল, ছোট বা বৃহৎ অনুভূতিগুলি থাকে, তা বন্ধুত্বের মধ্যে বিশেষ উঠে আসেনি। বনফুলের উপন্যাসে অনেকে বন্ধু উচ্চ ভাবলোকের অধিবাসী। আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিতে তারা তৎপর। সম্পর্ককে নিয়ে তাই তারা বেশি ভাবতে পারেনি। 'নবদিগন্ত', 'জঙ্গম' প্রভৃতি উপন্যাসের দিকে তাকালে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। বনফুল একটি সুসংহত পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের ছবি তুলে ধরে তার মধ্যে বন্ধুত্বের প্রসরময়, পরিপূর্ণ,সচল চিত্রায়ণ দেখাতে পারেননি। বন্ধুত্ব রূপায়ণে এটি তাঁর অন্যতম ত্রুটি।

তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য প্রমুখ সাহিত্যিকের সমসাময়িককালে কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক অবিস্মরণীয় নাম। মূলত উপন্যাস এবং ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যজগতে আবির্ভাব এবং বিকাশ। মাত্র আটচল্লিশ বছরের স্বল্পময় জীবনের বেশিরভাগ সময়টা কেটেছিল সাহিত্যচর্চায়। তাঁর প্রথম আবির্ভাব ১৩২৯ সালে, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অতসীমামী' গল্প রচনার মাধ্যমে। সাহিত্যিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে বিষয়কে তাঁদের সাহিত্যচর্চায় প্রধান নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করতেন অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলতে গেলে প্রেম, সেই প্রেমকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রধান বিষয় রূপে গ্রহণ করে, নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে বাজী জিততে চেয়েছিলেন। গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে প্রথম গল্পে লেখক যে প্রেম সম্পর্কের সাহায্য নিয়েছিলেন, উপন্যাস জগতে প্রবেশ করেও তিনি সেই প্রেমকে মূল অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অনেক উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হল প্রেম। তিনি যৌন অনুভূতিসম্পন্ন প্রেমের রূপকার। এছাড়া তাঁর উপন্যাসে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রেমের উপর প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিকটি। মানিকের উপন্যাসে প্রেম যতখানি প্রসার বা প্রাধান্য লাভ করেছে, অন্য সম্পর্ক ততখানি করে উঠতে পারেনি। অথচ প্রথম উপন্যাস 'জননী'তে তিনি নারীর চিরন্তন মাতৃমূর্তির রূপকে চিত্রিত করেছিলেন। নারীর সন্তানবাৎসল্য, তার স্নেহ-ভালোবাসার এক ঐশ্বর্যময়ী রূপকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারপর থেকে তিনি উপন্যাসে প্রেমকে নিয়ে কাহিনির রসায়ন তৈরি করেন। আর বলতে গেলে প্রায় সমস্ত প্রেমের মধ্যে লুকিয়ে ছিল ফ্রয়েডীয় ভাবনার চোরাস্রোত। সামাজিক জীবনে মানবিক সম্পর্কের যে বৃহৎ প্রবাহ আছে, মানিক সেদিকে বিশেষ নজর দেননি। তাঁর দৃষ্টি ছিল এককেন্দ্রিক। অভিজ্ঞতা যে কোনো সাহিত্যিকের কাছে অন্যতম বড় সম্পদ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি ছিল সমৃদ্ধ। আর এই অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন স্বতন্ত্র এক সাহিত্যের জগৎ।

সামাজিক সম্পর্ক রূপে প্রেম এবং সমকালীন সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমাজবাস্তবতা ছিল মানিক উপন্যাসের বড় অবলম্বন।কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মতোই তাঁর উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনি বিশেষ নেই। শরৎচন্দ্রের মতো পারিবারিক জীবনের চিত্র নেই। বিভূতিভূষণের মতো প্রকৃতিমুগ্ধতা নেই। তারাশঙ্করের মতো সমাজের একেবারের নিচুতলার অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনচিত্রও নেই। আমরা জানি আমাদের পারিবারিক বা সামাজিক জীবন হল বহুবিধ সম্পর্কের উৎসখনি। সেখান থেকে পাওয়া যায় বিভিন্ন সম্পর্ক – অর্থাৎ মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সব সম্পর্ককে। যারা সামাজিক জীবনের রূপকার, গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবনের নিখুঁত চিত্রকার, তাঁদের রচনায় সম্পর্কের বিচিত্র চিত্র প্রকাশ পায়। মানিক ছিলেন বাস্তববাদী জীবনশিল্পী। প্রেম ছাড়া সামাজিক জীবনের অন্যান্য সম্পর্কগুলো স্বাভাবিকভাবে তাঁর উপন্যাসে এলেও তিনি সেখানে বৈচিত্র্যের সন্ধান বিশেষ দিতে পারেননি। তাঁর উপন্যাসে মানবজীবন বা সম্পর্কগুলো অনেকক্ষেত্রে সামাজিক বা অর্থনৈতিক ভাবের দ্বারা প্রবাহিত। সেখানে দেখা গেছে বিভিন্ন সমস্যা, টানাপোড়েন দ্বন্দ্ব প্রভৃতি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক সমস্যার রূপকার, মানব সম্পর্কের বৈচিত্র্যময় চিত্রকর নয়।

মানিক উপন্যাসে বন্ধুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার আগে তাঁর জীবনের সঙ্গে 'বন্ধু' শব্দটি কতখানি জড়িয়ে ছিল, তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। কেননা আমরা দেখেছি ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধুবাহুল্য বা বন্ধু সংসর্গের প্রাচুর্যের কারণে কিছু সাহিত্যিকের রচনায় বিশেষত গল্প, উপন্যাসে সম্পর্কটির অত্যাধিক প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। অবশ্য মানিকের জীবনের দিকে তাকালে বরং এর বিপরীত চিত্রই পরিলক্ষিত হয়। মানিকের জীবনে বন্ধুপ্রাচুর্য ছিল না। এমনকি বন্ধুরূপে রবীন্দ্রনাথ, বনফুল বা শরৎচন্দ্রের মতো আকর্ষণীয়ও তিনি ছিলেন না। সমালোচকের ভাষায় বন্ধুরূপে তাঁর বৈশিষ্ট্যটি এইরূপ – "সঙ্গী হিসাবে তিনি যে খুব স্পৃহণীয় ছিলেন তা বলা যায় না, বরং এই বললেই ঠিক বলা হয় যে, তাঁর সহজাত আত্মমগ্ন স্বভাব ও ভাবুকতা বন্ধুত্বকে আকর্ষণ করার পরিবর্তে বন্ধুত্বকে প্রতিহত করতেই বেশি সাহায্য

করত।"[৫] তবে মানিকের সাহিত্যে আসার পেছনে পরোক্ষভাবে তাঁর বন্ধুদের ভূমিকা কম ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ধরেই তিনি প্রথম গল্প 'অতসীমামী' লিখেছিলেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে বন্ধুদের ভূমিকা তো তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে আগমনের পেছনে রয়েছে। কিন্তু তিনি যে বন্ধুর সংসর্গ বিশেষ পছন্দ করতেন না, তা তাঁর জীবনের বন্ধুসংখ্যার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। শ্রদ্ধেয় সমালোচক নিতাই বসু লিখেছেন – "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বভাবের দিক দিয়ে নির্জন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এই নির্জনতাই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় স্ব-বিরোধিতা।"[৬] সুতরাং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর জীবনবৃত্তে বন্ধু প্রবেশ বেশি করেনি। আবার কলেজ পড়ার সময় তিনি বন্ধুসংসর্গে মদ্যপান করতেন তাও জানা যায়। আসলে মানিকের পারিবারিক বৃত্ত বা নিজস্ব চারিত্রিক স্বতন্ত্রতা ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে মানুষের সঙ্গে অবারিতভাবে মেশার সুযোগ দেয়নি। অথচ নিজে ছিলেন মানবদরদী। মানিক বাস্তবজীবনে বোধহয় বন্ধুদের মধ্যে ভালো বা মহৎ ভাব দেখতে পাননি। তা না হলে তাঁর গল্প বা উপন্যাসে মহৎ বা আদর্শ বন্ধুর ছবি নেই কেন? মানিক সাহিত্যে বন্ধুত্বের কোনো চিরন্তন মূল্যবোধের ছবি চোখে পড়ে না। অধিকাংশক্ষেত্রে বন্ধুত্বের মধ্যে স্বার্থ, হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতির প্রবাহ লক্ষ্য করা গেছে। সম্ভবত যুগ পটভূমি বা যুগ বাস্তবতাই তার প্রধান কারণ। যুগের প্রভাব মানিক সাহিত্যের উপর গভীরভাবে পড়েছে। তবে অবাক হওয়ার কথা বাস্তব জীবনে বন্ধু অপ্রাচুর্যতা থাকা সত্ত্বেও এই সম্পর্কটি তাঁর উপন্যাসে বহুবার উঠে এসেছে। কিন্তু এলেও প্রেমের মতো সস্তা, সুলভ উপাদানকে হাতে পেয়ে, তিনি বন্ধুত্বকে নিয়ে সেভাবে ভাবেননি। তবু রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তীযুগে মানিক অধিক সংখ্যক বন্ধুত্ব সম্পর্কের আবির্ভাবক, আর সেখানে বিশেষ এক ভাবের রূপায়ণকারী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু সংখ্যক উপন্যাসে বন্ধুত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অনেক গল্পেও এই সম্পর্কটির প্রবেশ ঘটেছে। উপন্যাসক্ষেত্রে 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'অহিংসা', 'চতুষ্কোণ', 'শহরবাসের ইতিকথা', 'জীয়ন্ত', 'ইতিকথার পরের

কথা', 'আরোগ্য', 'শুভাশুভ', 'মাশুল' প্রভৃতি উপন্যাসে এই সম্পর্কটির আবির্ভাব ঘটেছে। তবে তাঁর উপন্যাসে বন্ধুত্বের উপস্থিতি বহুবার লক্ষ্য করা গেলেও, রূপায়ণগত আংশিকতার দিকটি সেখানে অত্যন্ত প্রকট। একমাত্র 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বা 'অহিংসা' ছাড়া আর কোনো উপন্যাসে সেভাবে সম্পর্কটির বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ হয়নি। শুধু তো সম্পর্ক সৃষ্টি করলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না তাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে হয়, তার ক্রিয়াকে কাহিনিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা সামাজিক ছকের মধ্য দিয়ে তার বহুবিচিত্র রূপকে কাহিনিতে প্রকাশ করতে হয়। তবে সেই সম্পর্কের রূপায়ণগত সার্থকতা সূচিত হয়। সেদিক দিয়ে মানিক উপন্যাসে বন্ধুত্ব অনেক এলেও কাহিনিতে গুরুত্ব বা প্রসারের দিক দিয়ে দু-একটি উপন্যাস ছাড়া তাঁর বলার মতো উপন্যাস নেই। বন্ধুত্বের যে চিরন্তন আদর্শ আছে, শাশ্বত সর্বকালীন আবেদন আছে, তা তাঁর উপন্যাসের বন্ধুত্বের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। উপন্যাসে বন্ধুত্বের পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা কম, পারস্পরিক প্রভাবও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। মানিক উপন্যাসে বন্ধুত্ব যে শুধু পুরুষদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে তা নয়। কিছু উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যেও তা প্রত্যক্ষ করা গেছে। তাঁর উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্ক এক আলোচিত বিষয়। মানিক কয়েকটি উপন্যাসে নর-নারীর মধ্যে বন্ধুত্বের ভাব জাগিয়ে উভয়ের সম্পর্ককে এক ভিন্ন দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর এরকম কয়েকটি উপন্যাস হল 'দর্পণ' (আরিফ-মমতা), 'শহরবাসের ইতিকথা' (মোহন-সন্ধ্যা), 'চালচলন' (সুনীল-রেনু), 'ইতিকথার পরের কথা' (লক্ষ্মী-কৈলাস), 'পাশাপাশি' (সুনীল-মায়া) প্রভৃতি। এই সব উপন্যাসে নারী এবং পুরুষের সম্পর্ককে বন্ধুত্বের গণ্ডীতে ফেলে দিয়ে তার একটা বাস্তব দিককে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। এক পুরুষ আর এক নারীর মধ্যে কতখানি সুস্থ বন্ধুত্ব গড়ে তোলা সম্ভব? অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে বিবাহ ছাড়িয়ে বন্ধুত্বের পর্যায়ে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সেখানে নায়িকা অশ্রু মন্তব্য করেছিল – "বিয়ের চেয়ে বন্ধুতাই বড়ো জিনিস"[৭] মানিক তাঁর উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কে এই বন্ধুত্বের ভাব জাগাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেখা গেছে সেখানে দুই পুরুষের

মতো সহজ, নিষ্কাম, স্বাভাবিক ভাব নিয়ে এক নারী ও এক পুরুষ বন্ধুত্ব করে উঠতে পারেনি। অনেকক্ষেত্রে একপক্ষের আকর্ষণ স্পষ্ট হয়ে গেছে। যেমন 'চালচলন'এ সুনীল এবং রেনু তাদের সম্পর্ককে বন্ধুত্বের পর্যায়ে যতই তুলে ধরার চেষ্টা করুক না কেন, শেষে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ পেয়ে গেছে। কাহিনির বর্ণনায় – "পরস্পরের জন্য তারা একটা আকর্ষণ অনুভব করে। মাঝে মাঝে আজকাল আকর্ষণটা এমন তীব্রভাবেই অনুভব করে যে দুজনেই তারা কিছুক্ষণের জন্য রীতিমতো ভাবনায় পড়ে যায়।"[৮] 'শহরবাসের ইতিকথা'য় সন্ধ্যা মোহনকে যতই বলুক না কেন যে – "ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু বন্ধুত্বকে তার আস্থা আছে"[৯] – অথচ সন্ধ্যার প্রতি মোহনের কোনো এক সময় কামনার আগুন দেখা দিয়েছিল। 'দর্পণ'-এ মমতা হীরেনকে বিবাহ করে, অথচ তার পরেও সে বন্ধুরূপে আরিফের কাছে চুম্বন কামনা করে। স্বামীর কাছে সে বলে – "দু-চারবার এমনও হয়েছে যে ওর জন্য আমি জোরালো সেক্স আজ অনুভব করেছি। যোগাযোগ হলে হয়ত কিছু ঘটেও যেতে পারত আমাদের মধ্যে।"[১০] সাধারণভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে উঠবার অবকাশ কম। নর-নারীর প্রকৃতিগত চিরন্তন আকর্ষণধর্ম সেখানে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নারী-পুরুষ যতই পরস্পর নিজেদের বন্ধুত্বের পবিত্র বেদিতে তাদের সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করুক না কেন, বিপরীতধর্মী আকর্ষণের যে প্রবাহ আছে, তাকে সহজে উপেক্ষা করা যায় না। আর মানিকবাবুর মতো ফ্রয়েডবাদী লেখক সেটা ভালো বুঝবেন না তো কে বুঝবেন। তাঁর উপন্যাসে নর-নারী স্বাভাবিক বন্ধুত্ব করতে চাইলেও করতে পারেনি। কেউ না কেউ আকর্ষণ প্রকাশ করে ফেলেছে। মানিক উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেও আবার বন্ধুত্ব ভাবনার চিত্র লক্ষ্য করা গেছে 'সহরতলী' (অজিত-সুব্রত), 'দর্পণ' (হীরেন-মমতা), 'স্বাধীনতার স্বাদ'(সুশীল-মণিমালা), 'সোনার চেয়ে দামী'(রাখাল-সাধনা) প্রভৃতি উপন্যাসে। 'মাশুল' উপন্যাসে নবেন্দু নমিতাকে বলেছে – "স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব থাকাই যথেষ্ট।"[১১] 'দর্পণ' উপন্যাসে হীরেন স্ত্রী মমতাকে মনে করেছে ' স্ত্রী তার সাথি, তার বন্ধু' [১২] আবার 'সোনার

চেয়ে দামী' উপন্যাসে জীবন পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে গিয়ে রাখাল স্ত্রী সাধনার সামনে মন্তব্য করেছে – "বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনোরকম সম্পর্ক সম্ভব নয়।"[১৩] তবে আমরা জানি যে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধুত্ব বাস্তব সমাজে প্রথাগত বা দৃশ্যমান বন্ধুত্বের মতো নয়, বরং সেটা এক বোঝাপড়ার সম্পর্কে তুলে ধরে। পারস্পরিক বিশ্বাস, একে অপরকে গভীরভাবে বোঝা, সুখ-দুঃখে পাশে থাকা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আসলে তা এক বোঝাপড়ার সম্পর্ক। কাজেই মানিক উপন্যাসে সঠিক অর্থে বন্ধুত্বকে দেখতে গেলে দুই পুরুষের সম্পর্কের সমীকরণের মধ্যে আমাদের যেতে হবে। সেখানে দেখতে হবে তার প্রকৃত চিত্র, তার দৃষ্টিভঙ্গি বা রূপায়ণ। সেদিক দিয়ে দেখলে তাঁর উপন্যাসের বন্ধুত্বে বৈচিত্র্যের আভাস খুব কম। তিনি উপন্যাস লিখেছেন প্রচুর। অনেক উপন্যাসে তিনি এই সম্পর্কের প্রবেশ ঘটিয়েছেন, কিন্তু কোনো উপন্যাসে তিনি বন্ধুত্বকে কাহিনির প্রধান সম্পর্করূপে ঠাঁই দেননি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমাদের 'অহিংসা' উপন্যাসকে ব্যতিক্রম বলে মনে হতে পারে। এখানে কাহিনির প্রধান দুই পুরুষ চরিত্র সদানন্দ এবং বিপিনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। দুই চরিত্রেরই কাহিনির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তার। তবে সেখানেও মাধবীকে নিয়ে সদানন্দের কামনা-বাসনা এবং তা থেকে বিপিনের মাধবীকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা বা একটা আশ্রমকে কেন্দ্র করে কিছু লোকের ভণ্ডামি বা স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে এইরকম একটি বিষয়ের উপর গঠিত উপন্যাসে সদানন্দ-বিপিনের সম্পর্কের প্রবাহটি বেশি জায়গা পায়নি।

মানিক তাঁর উপন্যাস জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে বন্ধুত্বকে কাহিনিতে ঠাঁই দিয়েছিলেন। প্রথম দিককার 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বা শেষ পর্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ' প্রভৃতি অনেক উপন্যাসেই ঘটেছে এই সম্পর্কের প্রবেশ। মানিক উপন্যাসে বন্ধুর যে পরিচয় পাই তারা সকলেই প্রায় স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, লোভী, আত্মকেন্দ্রিক, অনুদার। মহৎ, পরোপকারি বন্ধু তাঁর উপন্যাসে আমাদের বিশেষ চোখে পড়ে না। শুধু উপন্যা নয়, গল্পগুলিতেও সেই চিত্র চোখে পড়ে। তিনি বন্ধুত্বের মধ্যে সুস্থ-সুন্দর ভাবকে

তুলে ধরার বিশেষ চেষ্টা করেননি। সেখানে দেখা দিয়েছে সমস্যা। বাস্তবসমস্যা, অর্থনৈতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি সেখানে সম্পর্কের উপর বৃহৎ প্রভাব ফেলেছে। মানিক উপন্যাসে যে সব বন্ধুত্ব সম্পর্ক এসেছে, সেগুলি হলো শশী-কুমুদ (পুতুল নাচের ইতিকথা), সদানন্দ-বিপিন (অহিংসা), রাজকুমার-শ্যামল (চতুষ্কোণ), চিন্ময়-মনমোহন (সহরবাসের ইতিকথা), পাকা-কানাই-তিনু-পাঁচু (জীয়ন্ত), কেদার-পরিমল (পেশা), মনোজ-সুনীল (চালচলন), নন্দ-শুভ (ইতিকথার পরের কথা), কুমার-সমরেশ (শুভাশুভ), রমেশ-ব্যোমকেশ (মাশুল) প্রভৃতি। মানিক উপন্যাসে বন্ধুত্ব কোনো বিশেষ ভাবের দ্যোতক নয়। এখানে সামগ্রিকভাবে বন্ধুত্বের মধ্যে বিশেষ আদর্শবোধের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'অহিংসা' প্রভৃতি উপন্যাস, 'বিবেক', 'প্রাণাধিক', 'আততায়ী', 'ঢেউ' প্রভৃতি গল্পের বন্ধুত্ব স্বার্থবোধের দ্বারা তাড়িত। মানিক যে সময়ে বড় হয়েছেন তাঁর আশেপাশে বা নিজস্ব পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে সুস্থ, আদর্শভাবের বিশেষ সন্ধান পাননি। সমাজ, সম্পর্ক - সকলের মধ্যে তিনি দেখেছেন সমস্যা, অশান্তি, স্বার্থ, অবক্ষয় প্রভৃতির স্রোত। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো সুন্দর, আদর্শ, ঐতিহ্য বা সংস্কারের প্রতি আকৃষ্ট হননি। সমসাময়িক অসুস্থ, অবক্ষয়িত পরিবেশে বন্ধুত্বে তিনি দেখতে পাননি আদর্শস্পর্শিত রসধারা। স্বার্থবোধের দ্বারা চালিত বন্ধুদের মধ্যে মুখোশপরা বন্ধুদের নৈতিক অবক্ষয়কে তিনি প্রবলভাবে দেখতে পেয়েছেন। অর্থ আর স্বার্থের দাবি তাদের কাছে সবচেয়ে বড়। এতে যখন কারো ঘা লাগে, তখনই তাদের প্রকৃত মুখোশটি বেরিয়ে পড়ে। তাঁর 'এক বাড়িতে' গল্পে দেখা যায় বিলাসময় এবং সুধীর পরস্পর বন্ধু হয়েও বাড়ি ভাড়ার ঘটনায় কীভাবে উভয়ের বন্ধুত্বের আদর্শকে বিসর্জন দেয় স্বার্থের তাগিদে। সেখানে সুধীরের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে – "লেনদেনের ব্যাপারে বন্ধুত্ব টানতে নেই।"[১৪] 'প্রাণাধিক' গল্পে জ্যোতির্ময় তার বন্ধু অবনীকে কেরানীর চাকরি থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজস্ব এজেন্সিতে ঢুকিয়ে হাজার-হাজার টাকা কামানোর পরিকল্পনা করেছে। আবার 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে দেখা যায় যতীন তার বিশ হাজার টাকার চাল নষ্টের পেছনে বন্ধু সুশীলকে দোষী মনে করে যাচ্ছেতাইভাবে গালাগালি করেছে। এখানে স্বার্থের

দুয়ারে আঘাত লাগা বন্ধুর আসল চেহারাটা প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসেছে। এই সকল গল্প-উপন্যাসে মানিক বন্ধুত্বের কোনো সুস্থ মূল্যবোধকে তুলে ধরার চেষ্টা করেননি। স্বার্থ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ক্ষমতা প্রভৃতির ফলে সম্পর্কের ক্ষয়িষ্ণু চিত্র গল্প- উপন্যাসে হয়েছে বন্ধুত্বের মূল বিষয়। তাঁর উপন্যাসে এক বন্ধুর অপর বন্ধুর প্রতি গভীর হার্দিক টান নেই। জীবনক্ষেত্রে কোনো বৃহত্তর প্রভাব নেই। ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি তাদের একান্ত অনুরাগ। মানিক উপন্যাসে আদর্শবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ মহৎ বা উপকারী বন্ধুর দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র বিহারী বা তারাশঙ্করের 'কবি'র রাজনের মতো উদার, সুহৃদ বন্ধু মানিক উপন্যাসে নেই। 'স্বাধীনতার স্বাদ' বা 'অহিংসা'র মতো উপন্যাসে তিনি বন্ধুত্বের মধ্যে স্বার্থের ভাব ঢুকিয়ে তার একটি ভিন্ন রূপরেখা অঙ্কন করতে চেয়েছিলেন, যা বাস্তব দৃশ্যমান অবক্ষয়িত সমাজ বা ক্ষয়িষ্ণু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতো মানবিক সম্পর্কের অবক্ষয়িত একটা দিক। আবার রবীন্দ্রনাথ সহ অনেক ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে বন্ধুত্বে নারী এসে যে টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছিল, তার পুনরাবৃত্তি মানিক উপন্যাসেও ঘটেছে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় দেখা যায় তার ক্ষীণ আভাস, এবং 'অহিংসা'য় গিয়ে ধরা পড়ে তার বৃহৎ রূপ। এই দুই-একটি বিষয় ছাড়া মানিক উপন্যাসের বন্ধুত্বে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মানিক সর্বপ্রথম বন্ধুত্বের আবির্ভাব ঘটান শশী ও কুমুদের মধ্য দিয়ে। প্রকাশ সংখ্যার দিক দিয়ে এটি তাঁর তৃতীয় উপন্যাস। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কাহিনির প্রধান চরিত্র শশীর সঙ্গে অপর এক চরিত্র কুমুদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। একজন ডাক্তার আর অপরজন যাত্রাদলের অভিনেতা। স্বভাব চরিত্রেও উভয়ের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। কাহিনির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উভয়ের সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে দুই চরিত্রের স্বতন্ত্র জীবনছক আছে। কিন্তু কাহিনিতে তাদের নিজস্ব জীবনছক বা স্বতন্ত্র ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে বন্ধুত্বকে বেশি বিকশিত করে তুলতে পারেনি কেউই। উভয়ের বন্ধুত্বে যে মূল বিষয়টি চোখে পড়বে, তা হল মনস্তাত্ত্বিক ভাবময়তা। ঈর্ষা, হিংসা, ভালোবাসা

প্রভৃতির ভাবে উভয়ের সম্পর্ক প্রবাহিত। এখানে ঘটনা খুব কম, অথচ প্রতিফলন খুব স্পষ্ট। শশী-কুমুদ সম্পর্কে পারস্পরিক ভালোবাসা আছে, প্রভাবের কথাও কাহিনিতে উল্লেখ আছে। আবার কুমুদ যখন মতিকে ভালোবেসে তাকে বিবাহ করার বাসনা বন্ধু শশীকে জানায়, তখন শশীর ভালোবাসাবোধ পরিণত হয় ঈর্ষা বা হিংসায়। কাহিনিতে তার মনের প্রতিক্রিয়াটি দেখা যায় এভাবে – "কুমুদকে সে এই দণ্ডে দূর করিয়া দেয়। চিরদিনের জন্য বন্ধুত্বকে অবসান হোক, – কুমুদ চলিয়া যাক তাহার যাযাবর জীবন যাপনে।"[১৫] এক মেয়ের জন্য শশী তার বন্ধুত্বকে চিরদিনের জন্য বিসর্জন দিতে চেয়েছে। বন্ধুকে ঠেকাতে সে নিজে মতিকে বিয়ের চিন্তা পর্যন্ত করেছে। সুতরাং শশী চরিত্রের এই মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। নারী যে বন্ধুত্বের মধ্যে টানাপোড়েনের সৃষ্টি করে মানিক এখানে তার ইঙ্গিত রেখেছেন। তবে এই দু-একটি বিষয় ছাড়া এই উপন্যাসে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে গভীর বিশেষত্ব আমাদের চোখে পড়ে না। সম্পর্কের পারস্পরিক যোগসূত্রটিও তেমন দৃঢ় নয়।সম্পর্কের গভীর টান এখানে নেই। সম্পর্কের দিক দিয়ে দেখলে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় শশী-কুমুদের সম্পর্কই হল কাহিনির মূল উপজীব্য বিষয়, অন্য কিছু নয়।

'অহিংসা' উপন্যাসটি একটি আশ্রমের পটভূমিতে মানব সম্পর্কের টানাপোড়েনের কাহিনি। এখানে পারিবারিক জীবনের বিশেষ ছবি নেই। আশ্রমকে কেন্দ্র করে মানব সম্পর্ক এবং তার রহস্যময় দিকটি এখানে মুখ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। এখানে কাহিনির মূল গতিপথে আছে মূলত তিন চরিত্র - সদানন্দ, বিপিন এবং মাধবীলতা। মাধবীলতা বা মাধবী নামক নারী চরিত্রই উপন্যাসে অপর দুই প্রধান চরিত্রের কার্যকলাপ বা মনোভাব স্ফুরণের প্রধান উৎস। সদানন্দ এবং বিপিন উপন্যাসে এসেছে দুই বন্ধু রূপে। আবার আশ্রমের দিক দিয়ে তাদের সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের। তবে কাহিনিগত দিক থেকে উভয়ের সম্পর্কে যে ভাবটিকে লক্ষ্য করা যায়, তা মূলত পারস্পরিক ঈর্ষা, ঘৃণা, বিবাদ এবং স্বার্থের। লেখক প্রথম থেকে মাধবীকে কেন্দ্র করে সদানন্দ-বিপিন সম্পর্কে এই সকল ভাবের প্রবেশ

ঘটিয়েছেন। সদানন্দ এবং বিপিনের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ, হৃদ্য সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, স্বার্থ কীভাবে তাদের সম্পর্কের স্থায়িত্বকে নষ্ট করে দেয়, লেখক এখানে তা দেখিয়েছেন। প্রথম অধ্যায়ে সম্পর্কটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং কাহিনির প্রায় সমস্ত অংশ জুড়ে স্বার্থের ভাবে উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে বিচিত্র ভাব, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে, উপসংহারে বন্ধুত্বে একটি মলিন অনুভূতির জন্ম দিয়েছে। 'অহিংসা' উপন্যাসে প্রধান দুই চরিত্রের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। মাধবীকে বিপিনের আশ্রমে নিয়ে আসা, সদানন্দের তার উপর আকৃষ্ট হওয়া, এতে বিপিনের বাধা দেওয়ার চেষ্টা প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে নিহিত উভয়ের সম্পর্কের প্রবাহ। নারী এবং অর্থ – এই দুটি বিষয় 'অহিংসা' উপন্যাসে সদানন্দ এবং বিপিনের সম্পর্ক রূপায়ণে গভীরভাবে এসেছে। যে যুগবাস্তবতা মানিক উপন্যাসের অতি আলোচিত বিষয়, এখানে বন্ধুত্ব সম্পর্ক চিত্রণে তার ছায়া অনেকটা লক্ষ্য করা গেছে। লেখকের সূক্ষ্ম বাস্তব অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি শক্তির নিপুণতায় রচিত সদানন্দ-বিপিন সম্পর্কের জটিল স্রোত কাহিনিতে এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। মানিক যে কোনো সমস্যার দিকে বেশি দৃষ্টি দিতেন। 'অহিংসা'য় উভয়ের সম্পর্কে সমস্যাময় দিকগুলি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এবং সেই সমস্যার সমাধান তিনি করে দিয়েছেন কাহিনির শেষদিকে সম্পর্কের বিনাশ ঘটিয়ে। স্বার্থ যে কোনো সম্পর্কের বুনিয়াদকে ভেঙে দেয়। সদানন্দ এবং বিপিনের মধ্যে স্বার্থের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বলে শৈশবকালের গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। আশ্রমকে কেন্দ্র করে বিপিন এবং সদানন্দের ভাবনার ব্যবধান মাধবীর আগমনে তা আরো প্রকট হয়। এবং ধীরে-ধীরে কয়েকটি ঘটনায় উভয়ের সম্পর্কের বিনাশের চিত্রপট তৈরি হতে থাকে। মাধবীকে কেন্দ্র করে উভয়ের আলোচনার একটি দৃষ্টান্ত –

" বিপিন বলিল, ওটাকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি করছিস সদা।

সদানন্দ বলিল, তুই তো সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি দেখিস।

বিপিন বলিল, ওকে আশ্রমে এনেছি আমি।

সদানন্দ বলিল, তাই বলে ওর ওপরে তোর অধিকার জন্মেছে নাকি?

বিপিন বলিল, অধিকারের কথা নয়। ওর ভালোমন্দের একটা দায়িত্ব আমার আছে?

সদানন্দ বলিল, অ! ভালোমন্দের দায়িত্ব!

তারপর বিপিন চলিয়া গেল নিজের ঘরে, সদানন্দ বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল নদী। এ কী কলহ? এ তো নিছক কথোপকথন, অলস মধ্যাহ্নের স্বাভাবিক আলাপ। কিন্তু নিজের নিজের ঘরে বসিয়া বিপিনের উপর সদানন্দের আর সদানন্দের উপর বিপিনের রাগে গা যেন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। একজন আর একজনের কত অন্যায়, কত অবিচার, কত স্বার্থপরতা আজ পর্যন্ত সহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর সত্যই সহ্য হয় না একেবারে যেন পাইয়া বসিয়াছে।''[১৬]

সামাজিক জীবনে স্বার্থের কাছে সবকিছু তুচ্ছ। সম্পর্ক, মূল্যবোধ, আদর্শ – সমস্ত স্বার্থের কাছে চাপা পড়ে যায়। এই উপন্যাসে সদানন্দ-বিপিনের গভীর বন্ধুত্ব স্বার্থের স্রোতে শেষ পর্যন্ত খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে? আশ্রমকে কেন্দ্র করে বিপিনের মধ্যে যে স্বার্থ লুকিয়ে ছিল, সদানন্দ তাতে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তা মনে করে সদানন্দের সঙ্গে বিপিনের ক্রমশই একটা দূরত্ব তৈরি হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিপিনের কাছে সদানন্দ হয়ে দাঁড়ায় অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক। যার অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কের বিনাশ। 'অহিংসা' উপন্যাসের অনেক পরে জীবনের শেষ দিকে মানিক 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসের স্বল্প অংশে সুশীল-যতীন সম্পর্কে এমনই স্বার্থময় ভাবে বন্ধুত্বের রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন। সেখানে সুশীল ও যতীন ছিল পরস্পর ছেলেবেলার বন্ধু। কিন্তু যখন তাদের স্বার্থে ঘা পড়েছে, তখন খসে গেছে বন্ধুত্বের মুখোশ। যতীনের মধ্যে স্বার্থের প্রবেশ তার জীবনে বন্ধুত্ব বা অন্য সবকিছুকে তুচ্ছ করে দিয়েছে। কাহিনিতে যতীন তার বন্ধুকে পথে বসিয়েছে। লাখপতি হওয়ার লোভে সুশীল তার যথাসর্বস্ব বন্ধুর চোরাকারবারে ঢেলেছিল, অথচ যতীন তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। মারামারি, জেল-হাজত পর্যন্ত হয়ে গেছে। খসে গেছে সম্পর্কের শেষ আবরণটুকু। মানিকের 'শহরবাসের ইতিকথা'য় দেখা যায় পীতাম্বরের পূর্বপুরুষ তীর্থে যাওয়ার

আগে তার সমস্ত সম্পত্তির দেখাশোনার ভার বিশ্বাসী বন্ধুর হাতে তুলে দিলে বহুদিন পর সে যখন গৃহে ফিরে আসে, তখন দেখে যে বন্ধু তার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে বসে আছে। স্ত্রী-পুত্রের আর অন্ন জোটে না। মানিক উপন্যাসে এরকম বন্ধুর দৃষ্টান্ত বেশ লক্ষ্য করা যায়। 'অহিংসা', 'শহরবাসের ইতিকথা' বা 'স্বাধীনতার স্বাদ প্রভৃতি উপন্যাসে বন্ধুত্বে স্বার্থ এসে সম্পর্কের বুনিয়াদকে প্রবল ভাঙনের সামনে দাঁড় করিয়েছে। স্বার্থ কখনো সম্পর্কের সৌধকে চিরস্থায়ী করতে পারে না। এক সময় অনিবার্যভাবে তা ভেঙে পড়ে। এ সকল উপন্যাসের বন্ধুত্বে সেটাই লক্ষ্য করা গেছে।

'শহরবাসের ইতিকথা' উপন্যাসে চিন্ময়-মনোমোহন বন্ধুত্বের অস্পষ্ট চিত্র আছে। মনোমোহন কাহিনির প্রধান চরিত্র, আর তার পাশে চিন্ময় কাহিনিতে গৌণ চরিত্র। মনোমোহন গ্রাম ছেড়ে কলকাতা শহরে চলে এলে, চিন্ময়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের আভাস এবং সামান্য যোগাযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে উভয়ে সম্পর্কে বিশেষ কোনো ভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়নি। উপন্যাসটি আকারে ছোট, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বও তেমন নেই। 'চতুষ্কোণ' লেখকের এমন এক উপন্যাস যেখানে বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাদামাটা। রাজকুমার-অজিত বা রাজকুমার-পরেশ সম্পর্কটি সেখানে অত্যন্ত ঝাপসা। এখানে লেখকের মূল উদ্দেশ্য ছিল যৌন অনুভূতিসম্পন্ন প্রেমজ আকর্ষণকে ফুটিয়ে তোলা। তাই সেখানে অন্য কোনো সামাজিক সম্পর্কই বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি। আবার 'জীয়ন্ত' উপন্যাসে লক্ষ্য করা গেছে এক বন্ধুগোষ্ঠী। সেখানে পাকা, কানাই, তিনু, পাঁচু, নরেশ প্রভৃতি একদল ছেলে। কৈশোর বন্ধুত্বের কিছু টুকরো-টুকরো ছবি, ঘটনা ফুটে উঠেছে তাদের সম্পর্কে। কিন্তু পরিণত বয়সের পথে এগিয়ে গেলে প্রত্যেক মানুষেরই যে নিজস্ব জীবনসংগ্রাম, দৃষ্টিভঙ্গি বা ভাবনাগত পরিবর্তন দেখা যায়, এখানে বন্ধুগোষ্ঠীর যুবকদের মধ্যে তা লক্ষ্য করা গেছে। পরবর্তী জীবনে তারা সঙ্গহীন হয়েছে। জীবনযুদ্ধে প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে যাত্রা করেছে। আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লেখক এই উপন্যাসে বন্ধুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন – "সাধারণ বন্ধুত্ব সুযোগ

সুবিধার ব্যাপার। বিপ্লব বন্ধুত্ব গড়ে অন্যরকম।"[১৭] এই উপন্যাসে কিছু যুবকের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্কের পরিচয় থাকলেও, সন্ত্রাসবাদীদের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এখানে মুখ্য। পারিবারিক জীবন, সম্পর্ক, সবকিছুই তাই গৌণ হয়ে গেছে। তাই বন্ধুচক্রের বন্ধুদের বন্ধু না বলে বরং বিপ্লবী আন্দোলনের সহকর্মী বলা ভালো। সাধারণ, স্বাভাবিক সম্পর্কের সচল প্রবাহ এখানে বিশেষ নেই।

'পেশা' উপন্যাসে কেদার ও পরিমলের মধ্যে যে সম্পর্ক দেখা গেছে তাকে লেখক পরিস্কার বন্ধুত্ব বলে উল্লেখ করেননি। উপন্যাসে যদি তাদের বন্ধু বলে ধরেও নেওয়া যায় তাহলে সেখানে তাদের সম্পর্কের উজ্জ্বল চিত্র বেশি চোখে পড়বে না। দুই চরিত্রের জীবনপথ আলাদা, উদ্দেশ্যও অনেক ভিন্ন। আবার 'চালচলন' উপন্যাসে মনোজ ও সুনীলের মধ্যে নিবিড় যোগ আছে, কিন্তু সম্পর্কটির বৃহত্তর ক্রমবিকাশ নেই বা প্রসারও নেই। গুরুত্বও তেমন নেই। তবে উভয়ের সম্পর্কে সামান্য হার্দিক আকর্ষণের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। মানিকের জীবনের শেষদিকে রচিত 'শুভাশুভ' উপন্যাসে কুমার ও সমরেশ সম্পর্কে হৃদয় গভীরতা আছে। তবে সেখানেও দুই চরিত্রের বিবর্তন ভিন্নপথে সাধিত হয়েছে। এখানে সমরেশ চরিত্রের গুরুত্ব বেশি, কুমারের অনেকটা কম। বাল্যকালে গড়ে ওঠা উভয়ের বন্ধুত্ব কাহিনির বিভিন্ন ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়ে চালিত হবার অবকাশ বিশেষ পায়নি। সম্পর্কটির রূপায়ণগত আংশিকতার দৃশ্য বেশি চোখে পড়ে। এই সব উপন্যাসে সম্পর্কটির আগমনের উদ্দেশ্য পরিস্কার নয়। বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় লেখক সেখানে ফুটিয়ে তোলেননি। একই কথা বলা যায় তার 'মাশুল' উপন্যাসের সুনীল-সাধন বা রমেশ-ব্যোমকেশ বন্ধুত্ব সম্পর্কেও। মানিক উপন্যাসে অর্থনৈতিক সমস্যার চিত্র অত্যন্ত প্রকট। তাঁর অনেক উপন্যাসে অর্থনৈতিক জটিলতার স্রোতে মানবজীবনের বিপর্যস্ত রূপ চিত্র প্রতিফলিত। আবার অর্থনৈতিক উন্নতি ভিন্ন দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসটিতে দুই বন্ধু শুভময় এবং নন্দের মধ্যে কথোপকথনে ধরা পড়েছে লেখকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভাবনাটি।শুভ দেশে

শিল্প-আন্দোলন সৃষ্টি করে, দেশকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছে। সে তার বন্ধুর সামনে শিল্প-কারখানার অগ্রগতি সম্পর্কে ভাবনা ব্যক্ত করেছে। সে আদর্শবাদী, আবার তার বন্ধু এক সংগ্রামী চরিত্র। এখানে দুই বন্ধুর ভাবনা বা কথোপকথনের মধ্য দিয়ে লেখকের নিজস্ব অর্থনৈতিক উন্নতির দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। চরিত্র হিসেবে তাদের নিজ জীবনের অনুভূতি বা ছোট-ছোট ভাবনাগুলি ব্যক্ত হয়েছে। মানিক উপন্যাসে এই সম্পর্কটি অনেকবার আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু কাহিনিতে ঘটনাধারার দিকে তাকিয়ে দেখলে তার বিশেষ ভূমিকা দেখতে পাওয়া যাবে না। অনেকক্ষেত্রে ঘটনার প্রবাহপথে সে তার অস্তিত্ব হারিয়েছে। রূপায়ণগত আংশিকতার দিকটিও সেখানে বড় প্রকট। এছাড়া মানিক উপন্যাসে কোনো বন্ধুত্বই চিরস্থায়ী নয়।

বিশ শতকের ত্রিশ দশক থেকে সাহিত্যিক রূপে অন্নদাশঙ্কর রায়ের সগৌরব আবির্ভাব ঘটেছে। তবে পারিবারিক বা সামজিক জীবন বা মানবিক সম্পর্কের নিপুণ রূপকার রূপে নয়, একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে – তত্ত্বমূলক বা বৃহত্তর উপলব্ধির ভূমিতে দাঁড়িয়ে নর-নারীর জটিল ক্রিয়াকলাপ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তাঁর উপন্যাসে সাধারণ চলমান জীবন চিত্রের পরিবর্তে প্রতিফলিত হয়েছে অতিমানবীয় চিন্তাধারা। তবে এর পাশে সম্পর্ককে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। তাঁর উপন্যাসে সম্পর্ক এসেছে কাহিনির বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। তবে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার জন্য মানবের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সচল বা স্বাভাবিক প্রবাহ সেখানে নেই। আসলে যেখানে লেখকের ভাবনায় উচ্চ আদর্শ, গভীর সত্যদৃষ্টি বা বৃহৎ চিন্তাধারা প্রভৃতি স্রোত নিমজ্জিত থাকে, সেখানে মানবের স্বাভাবিক জীবনদৃশ্য সহজভাবে চিত্রিত হয় না। এই কারণে তাঁর উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর সহজ, স্বাভাবিক, দৈনন্দিন জীবনচিত্র বিশেষ প্রাধান্য পায়নি। সম্পর্ক এলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা সেখানে দেখা গেছে। তাঁর উপন্যাসে সামাজিক সম্পর্ক রূপে লক্ষ্য করা গেছে বন্ধুত্ব। কিন্তু লেখকের ভাবনার স্বাতন্ত্র্যের জন্য তা পূর্ণতা পায়নি। সম্পর্কের সহজ, স্বাভাবিক গতি সেখানে বিশেষ নেই।

অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য' ৬টি খণ্ডে বিভক্ত এপিক উপন্যাস পর্যায়ভুক্ত। এই উপন্যাসে বিষয় সম্পর্কে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উল্লেখ করতে পারি – "ইহাতে আধুনিক যুগের সমস্ত জটিল সমস্যা, সমস্ত নুতন অনিশ্চয়তামূলক পরীক্ষা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ; মানবকল্যাণের পরস্পর-বিরোধী আদর্শ অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইংল্যান্ডের পুরাতন উদারনৈতিক মত - ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন চেষ্টার জয় ঘোষণা, শ্রমিক, কমিউনিষ্ট ও বলশেভিক আদর্শের যুক্তিবিচার, গান্ধীবাদ ও অহিংস আন্দোলনের সার্থকতা ও সার্বভৌম প্রয়োগ, বুদ্ধিবাদ ও হৃদয়ানুভূতির তুলনা, যুদ্ধবর্জন ও শান্তিবাদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা, বিবাহ-বন্ধনের চিরন্তনতা, ইত্যাদি যে সমস্ত চিন্তাধারা যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্যাপীড়িত মানব-মনকে অহরহ আলোড়িত করিতেছে, তাহারা সকলেই এই উপন্যাসের অধ্যায়গুলিতে, মননশীলতা ও হৃদয়াবেগের সহিত যুক্ত হইয়া, প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে"[১৮] এছাড়াও কাহিনিতে একটা সামাজিক দিক আছে, যেখানে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধনসূত্রতা আছে। এখানেও দেখা গেছে বন্ধুত্ব। কাহিনির দুই প্রধান চরিত্র, সুধীর এবং বাদলের মধ্যে বন্ধুত্ব। 'সত্যাসত্যে' বন্ধুত্বের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের প্রাচুর্য আছে। উভয়ের জীবনের স্বাভাবিক গতি নেই। কাহিনির পরিণতিতে বাদলের মৃত্যু ঘটেছে। উজ্জয়িনীর সঙ্গে তার বিবাহ সাধিত হয় নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সুধীরের সঙ্গে বাদলের বন্ধুত্বও স্থায়ী হতে পারেনি। বাদলের মৃত্যুতে উভয়ের সম্পর্কের যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে। এই উপন্যাসে সম্পর্ক হিসাবে বন্ধুত্ব একটি বড় শক্তি , কিন্তু তার পারস্পরিক আদান-প্রদান বেশ কম। অন্নাদাশঙ্করের আর একটি উপন্যাস 'রত্ন ও শ্রীমতি'তে (১ম পর্ব) কাহিনির প্রধান দুই পুরুষ চরিত্র রত্ন ও প্রভাতের সম্পর্ক বন্ধুত্বের। তবে উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদানে একটি মুখ্য বিষয় – প্রেম প্রাধান্য পেয়েছে। প্রভাত রত্নের সামনে তার বাল্যপ্রেমের কথা তুলে ধরেছে, আর রত্নও বিধবা মালাদির প্রতি তার আকর্ষণের কথা বন্ধুর সামনে বর্ণনা করেছে। উপন্যাসটি আয়তনে এত ছোট যে একে ছোটগল্প বললে ভুল বলা হয় না। উপন্যাসটির

দ্বিতীয় খণ্ড বা তৃতীয় খণ্ড সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। 'রত্ন ও শ্রীমতি'তে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রটি দেখা গেছে দুই প্রধান চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য। তবে উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ কম। দুটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু এক নয়। সম্পর্কের স্বাভাবিক প্রবাহ সেখানে অল্পই পরিবেশিত।

মণীন্দ্রলাল বোসের 'জীবনায়ন' উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে একঝাঁক কিশোর বন্ধুত্বের ছবি। এই উপন্যাসের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দিকে রোম্যান্টিকতার ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। কাহিনির প্রধান চরিত্র অরুণ শিক্ষিত, সৌন্দর্যপ্রিয়, স্বপ্নলোকবিলাসী। মণীন্দ্রলাল পারিবারিক জীবনের গণ্ডীর মধ্যে পাত্র-পাত্রীর সচল যাত্রা বজায় রেখেছেন, তবে তাদের জীবন আর দশ - পাঁচটা সাধারণ সমস্যামুখর জীবনের মতো নয়। পারিবারিক সম্পর্ক তাঁর উপন্যাসে এসেছে। তবে শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার বা তারাশঙ্কর প্রমুখ ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে যে পারিবারিক বা সামাজিক জীবন দৃশ্যপট আছে, সেই রকম চিত্র মণীন্দ্রলালের উপন্যাসে নেই। তিনি 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের আগেই বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ করে 'প্রবাসী' পত্রিকায় গল্প - উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর 'জীবনায়ন' উপন্যাস অবশ্য বহু পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে চলমান পাত্র - পাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধন আছে। জীবনে চাওয়া-পাওয়ার প্রবাহ আছে। 'জীবনায়ন' উপন্যাসের মূল চরিত্র হল অরুণ। কাহিনিতে তার একটি পারিবারিক জীবন আছে, সামাজিক সম্পর্কের বন্ধন আছে। এই উপন্যাসে তাকে কেন্দ্র করে কতগুলি কিশোর বা যুবক বন্ধুত্বের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। অজয়, জয়ন্ত, শিশির, বাণেশ্বর প্রভৃতি গৌণ চরিত্রের সঙ্গে অরুণের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। পাশাপাশি তারা সকলে অরুণের স্কুলের সহপাঠীও বটে। এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে কৈশোরকালীন বন্ধুত্ব। স্বভাবত স্কুল জীবনের স্বাভাবিক ঘটনার স্রোতে তাদের সম্পর্কের প্রবাহ। একে অপরের বাড়ি যাতায়াত করা, কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা, নিজের দুঃখের কথা অপরের সামনে বর্ণনা প্রভৃতি স্কুল বা কলেজ জীবনের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে

তাদের বন্ধুত্ব পরিবেশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে অরুণকে কেন্দ্র করে একাধিক বন্ধুত্ব পরিবেশিত হয়েছে। তবে প্রসার বা গুরুত্বের দিক দিয়ে অরুণ-অজয় সম্পর্কের প্রবাহটি অন্য বন্ধুত্ব অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে বেশি। অরুণ বন্ধুত্বের সুবাদে অজয়ের বাড়িতে যাতায়াত বা তার পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করেছে। উভয়ের মধ্যে সমপ্রাণতার ভাবটিও বেশি লক্ষ্য করা যায়। কাহিনির শেষ দিকে অরুণের দিদি প্রতীমার সঙ্গে অজয়ের বিবাহ উভয়ের সম্পর্ককে বন্ধুত্ব থেকে আত্মীয়তায় গণ্ডীতে ফেলে দিয়েছে।

'জীবনায়ন' উপন্যাসে বন্ধুত্বের মধ্যে প্রভাব বা কার্যকারিতার দিকটি বিশেষ প্রতিফলিত হয়নি। স্কুল-কলেজ জীবনের বন্ধুত্বে অবশ্য তা খুব দেখাও যায় না। তবে এখানে চরিত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের ছোট-ছোট স্বপ্ন, আশা, পরিকল্পনা প্রভৃতি বন্ধুত্বের ঘেরাটোপেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখা গেছে। কাহিনিতে অরুণ, জয়ন্ত, অজয় প্রভৃতি চরিত্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তাদের বন্ধুদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। মণীন্দ্রলালের নিজস্ব রোমান্টিক সত্তার ছায়া এই উপন্যাসে বন্ধুত্ব সম্পর্কের প্রবাহে পড়েছে। এখানে চরিত্রগুলির মধ্যে সহজ কথাবার্তায় কবিত্ব, সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রকাশ ঘটেছে। তবে জয়ন্তকে কেন্দ্র করে অরুণের ভাবনায় লেখক বাস্তব বন্ধুত্বের এক সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। লেখকের মতে – "বন্ধুত্বের সূত্র অতি সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া রচিত, একবার কোথাও ছিঁড়িয়া গেলে, তাহাতে মোটা তালি দিয়া জোড়া যায় না।"[১৯] লেখকের এই উপলব্ধি কাহিনিতে শুধু অরুণ, জয়ন্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বাস্তব বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। আবার সময়ে সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পট পরিবর্তনের আবর্তে অনেক বন্ধুই অনেক সময় দূরে সরে যায়। কাহিনিতে অরুণের ক্ষেত্রে যা লক্ষ্য করা গেছে। বাস্তবে বিভিন্ন ঘটনা, জীবনযুদ্ধে বিভিন্ন সমস্যা বা জীবনের কর্মপথে বিভিন্ন সামাজিক বন্ধনের বাঁধনও যে অনেক সময় আলগা হয়ে যায়, অরুণের মধ্যে তা দেখা গিয়েছে। আবার সময় অনেক নতুন কিছুকে গ্রহণ করতে শেখায় বা বাধ্য করে। 'জীবনায়ন'-এ অরুণ, জয়ন্ত, অজয়, শিশির প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে যে

বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে সম্পর্কের অনিবার্য টান তেমন নেই। অরুণ ছাড়া আর বন্ধুচরিত্রগুলি উপন্যাসে অত্যন্ত গৌণ চরিত্র। অরুণের মতো প্রধান চরিত্রের সঙ্গে এই সকল গৌণ চরিত্রের বন্ধুত্ব বেশি প্রস্ফুটিত হতে পারেনি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অক্ষরে অক্ষরে' উপন্যাসটি প্রথমে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে 'সোনার তরী' পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরের বছর তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এই উপন্যাসটি মধ্যবিত্ত জীবনের পারিবারিক সম্পর্কের কাহিনি। প্রধান চরিত্র নীলকমল, তার ছোট বোন উর্মিলা, এদের পারিবারিক জীবনকে নিয়েই কাহিনির বিস্তার। তার পাশে বাইরের চরিত্র হল সরিৎ, নীলকমলের সঙ্গে যার সম্পর্ক বন্ধুত্বের। কাহিনিতে এই দুই চরিত্রকে নিয়ে উভয়ের সম্পর্কের অভিমানজনিত ভাবের চিত্র আছে, একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে যার সূত্রপাত। ঘটনাটি নীলকমলের বোন উর্মিলাকে বিবাহ করতে সরিৎ-এর অস্বীকার করা। এই ঘটনার ফলে নীলকমলের সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্কে অভিমান বা দূরত্বের আভাস, সম্পর্ক ছিন্নের সুর বেজে উঠেছে। এর পরে নীলকমল এবং তার বোন উর্মিলার প্রেস স্থাপনের প্রচেষ্টা, নীলকমলের বিবাহ, উর্মিলার একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে বাঁচার চেষ্টা প্রভৃতি নানা ঘটনায় কাহিনি তার উপসংহারের পথে যাত্রা শুরু করেছে। শেষ দিকে নীলকমলের অসুস্থ হওয়াকে কেন্দ্র করে ভাঙা বন্ধুত্ব আবার জোড়া লাগার সুযোগ পায়। উপন্যাসে কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক ভাবের উপর নীলকমল-সরিৎ-এর বন্ধুত্ব প্রবাহিত হয়েছে। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কটির রূপায়ণে কাজ করেনি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসে বন্ধুত্বের পরিধি এমনিতেই খুব ছোট। তাঁর দু-একটি উপন্যাসে সম্পর্কটির আবির্ভাব ঘটেছে। অথচ তা অস্পষ্ট, উদ্দেশ্যহীনভাবে, বিশেষ কোনো ভাবের দ্যোতক রূপে নয়। তাঁর 'অনুরাগিনী', 'অনামিতা' প্রভৃতি উপন্যাসে বন্ধুত্বের প্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঘটনার নিরিখে বা লেখকের রূপায়ণগত দুর্বলতায় সম্পর্ক সেখানে ঝাপসা থেকে গেছে। 'অনুরাগিনী' উপন্যাসে প্রদোষ-অমলেশ (তা ছাড়াও কাহিনিতে আরো দু-একটি বন্ধুত্বের উল্লেখ আছে) কিংবা 'অনামিতা'

উপন্যাসে বিমলেন্দু - জয়দেব সম্পর্কের চিত্রটি বিশেষ কোনো বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে বা লেখকের সামাজিক কোনো দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে পরিস্ফুট নয়। উপন্যাস দুটির কাহিনি কেন্দ্রিভূত এক বিশেষ চরিত্রের জীবনপটে। নরেন্দ্রনাথের উপন্যাসে বন্ধুত্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণির বন্ধুত্ব। সম্পর্ক রূপে তাঁর উপন্যাসে বন্ধুত্বের গুরুত্ব বা প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় না।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'অচিন রাগিনী' এক নারী আর দুই পুরুষের ভালোবাসার কাহিনি, তবে এই ভালোবাসা কোনো নারী-পুরুষের প্রেম-ভালোবাসা নয়। এক দিদিমা ও দুই বন্ধু পিলে আর তুলসীর পারস্পরিক স্নেহ-বাৎসল্যের কাহিনি। লেখকের বর্ণনায় – "পিলে নতুন-দিদিমা আর তুলসী, তিনজনকে নিয়ে এই টান-ভালোবাসার গল্প। শোনা পিলের মুখে।"[২০] উপন্যাসটি লেখকের শেষ পর্যায়ের রচনা। এখানে মানবিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে দুই বন্ধু এবং এক দিদিমার ক্রিয়াকলাপে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। বিষয়বস্তুর স্বতন্ত্রে এই উপন্যাস অন্য উপন্যাস অপেক্ষা অভিনবত্ব দাবী করতে পারে। কেননা এই ধরনের কাহিনি বাংলা উপন্যাসে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কাহিনিতে যে দিদিমার পরিচয় আমরা পাই, পিলে বা তুলসীর সঙ্গে তার বন্ধন রক্তের নয়। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় রক্তের বন্ধন অপেক্ষা হৃদয়ের বন্ধনই যে অনেক বড় হয়ে ওঠে, লেখক এখানে তা দেখিয়েছেন। কাহিনিতে নতুন দিদিমা তার নিজস্ব সাংসারিক জীবনের বাইরে পিলে এবং তুলসী নামে দুই ছেলের প্রতি অকৃত্রিম বাৎসল্যরস প্রবাহিত করেছেন।

'অচিন রাগিনী' উপন্যাস দিদিমা এবং দুই কিশোরের হৃদয় সম্পর্কের কাহিনি হলেও, তা আবার দুই বন্ধুর কাহিনিও বটে। উপন্যাসে পিলে আর তুলসী পরস্পর বন্ধু। তাদের পারস্পরিক জীবনের এক সচল প্রবাহ উপন্যাসে আছে। এছাড়া তাদের মধ্যে আছে হৃদয়জ স্রোত যা মান-অভিমান, স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত। আছে পারস্পরিক ভাবনা, একে অপরের জীবনে গভীরভাবে জড়িয়ে যাওয়ার চিত্র। এখানে আর

একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হল সম্পর্কের গভীর যোগসূত্রতা, কাহিনির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা বজায় রয়েছে। একমাত্র শেষে যখন নতুন দিদিমা পিলের পাশাপাশি তুলসীকেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাছে পেতে চেয়েছে, তখন তুলসীর অনাগ্রহে বা বাধায় প্রধান তিন চরিত্রের মধ্যে সংযোগছিন্ন হয়েছে। তার আগে এই তিন চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের সংযোগছিন্নের পটভূমি তৈরি হয়নি। কাহিনিতে কোনো এক সম্পর্কের উপস্থিতি যখন ঘটে, কিছুদূর যেতে না যেতে অনেক সময় তার সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। কাহিনির মধ্যে সে তার কার্যকারিতা বা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। লেখক এখানে চরিত্রের মধ্যেকার হৃদয় সম্পর্ক চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন, তাই এই তিন চরিত্রের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র তিনি রক্ষা করেছিলেন। নতুন দিদিমার সঙ্গে পিলে ও তুলসীর হৃদয়জ আকর্ষণ এখানে যেমন আছে, তেমনি এইরকম আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় পিলে ও তুলসীর মধ্যেও। আর এই আকর্ষণের মাত্রাতে বা গভীরতাতে এই উপন্যাসে বন্ধুত্ব এক উজ্জ্বল সম্পর্ক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

'অচিনরাগিনী' উপন্যাসে পিলে আর তুলসীর বন্ধুত্বকে লেখক বাল্যকাল থেকে গড়ে তুলেছেন। তারপর কৈশোরকালের পথ পেরিয়ে যৌবনকালের একটি জায়গায় গিয়ে তার ইতি টেনেছেন। কাহিনিতে উভয়ের বন্ধুত্বে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে বাল্যকাল বা কৈশোরকালের সময়টি। এই সময়কার বয়সের ধর্ম অনুসারে কিশোরদের যে স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা বা কাজকর্ম দেখা যায়, এখানে পিলে বা তুলসীর চরিত্রের মধ্যে তাই চিত্রিত। কৈশোরকালের বন্ধুত্ব বোধহয় সবখানে বা সর্বসময়ে একই রকম হয়। অর্থাৎ খেলাধুলা, আড্ডা দেওয়া, দুষ্টুমি করা, কখনো তুচ্ছ ঘটনায় মান-অভিমান করা, আবার তা ভুলে যাওয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের স্রোত প্রবাহিত হয়। কখনো সেখানে আবার প্রতিফলিত হয় ভবিষ্যৎ কল্পনা বা স্বপ্নের ইঙ্গিত। এক বন্ধু অপর বন্ধুর কাছে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, জীবনের লক্ষ্য প্রকাশ করে। আবার কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের গণ্ডীতে পদার্পণ করলে প্রবহমান জীবনের গতিপথে অনেক সময় সম্পর্ক আবার বিনাশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে যায়। সামাজিক চক্রে

কর্মের প্রবাহে, জীবনসংগ্রামে কে কোথায় ভেসে যায় - ফলে পূর্বেকার বন্ধুত্ব অনেক সময় রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই শেষে সম্পর্কের বিনাশ ঘটে বা তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়। বাল্যকাল বা কৈশোরের বন্ধুত্বের সঙ্গে যৌবন বা প্রৌঢ়কালের বন্ধুত্বকে কোনোভাবে মেলানো যাবে না। কেননা সময় বা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা হয়। এই উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে কৈশোরকালের সম্পর্কের প্রবাহ। দুই বন্ধু চারিত্রিক দিক থেকে বিপরীতধর্মী হলেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব। পিলে শান্ত, ভদ্র, নম্র, অথচ তার পাশে তুলসী অনেকটাই বেপোরোয়া, সাহসী, মেজাজী স্বভাবের। ছিপছিপে গড়ন, কালো রঙের মধ্যে বেশ একটা চকচকে ভাব। নতুন দিদিমা এই দুই বন্ধু পিলে আর তুলসীর নাম রেখেছেন যথাক্রমে 'গন্ধবামুন' আর 'গন্ধপাতা'। তবে পিলে তুলসীর মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলেও নতুন দিদিমাকে নিয়ে তাদের মনোভাব বা অন্তর্জগতের স্ফুরণ ঘটেছে বেশি। পিলে এবং তুলসীর পারস্পরিক সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন বা কার্যধারা অনেকটাই কম। তবে সেখানেও ভাব-ভালোবাসা, মান-অভিমান, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতির স্রোত আছে। উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতার তারটি শক্ত। কাহিনিতে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে স্বতন্ত্র এক চলার পথ আছে, কৈশোরসুলভ স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে। খেলাধুলা, গল্পগুজব, দুষ্টমি প্রভৃতি কৈশোরধর্মের সহজাত ক্রিয়াশীলতা আছে। আবার আছে মান-অভিমানের চিত্র। তুলসীর প্রতি দিদিমার একটু বেশি পক্ষপাতিত্ব আছে তা ধারণা করে পিলের মনে কিছুটা ঈর্ষা বা অভিমানের স্তূপ জমা হয়েছে। তুলসীর কিছু কাজ তার মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। তা সত্ত্বেও তার বন্ধুপ্রীতি অসীম। সে নতুন দিদিমা আর তুলসীকে খুশি করতে পারলেই সুখী। তার মনে তুলসীর স্থান খুব উঁচুতে। ভালোবাসা এবং অভিমান - এই দ্বিবিধ ভাবময়তায় কাহিনিতে তার বন্ধুসত্তাটি প্রতিষ্ঠিত। আবার তুলসীর দিক দিয়েও পিলের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এক গভীর অন্তরঙ্গতায় তুলসী পিলেকে নিয়ে জীবনে কোনোদিন বিয়ে না করার শপথ নিয়েছে। তবে পিলের তুলসীর প্রতি যতখানি চিন্তা - ভাবনা বা হৃদয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, তুলসীর পিলের প্রতি ততখানি দেখা যায়নি। নতুন দিদিমা ছাড়া আর কারো প্রতি তার অন্তরের গোপন অনুভূতি বিশেষ ব্যক্ত হয়নি।

'অচিন রাগিনী' উপন্যাসে পিলে আর তুলসীর সম্পর্কের যোগসূত্র কাহিনির একেবারে শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। পরবর্তী সময়ে যৌবনের ভূমিতে দাঁড়িয়ে উভয়ের জীবনতরী ভিন্ন দিকে চালিত হয়েছে। পিলে হয়েছে ডাক্তার আর তুলসী নার্ট্রিনদের দলের সঙ্গে হয়েছে যুক্ত। কাহিনির শেষদিকে অসুস্থ তুলসী ডেকেছে তার বন্ধু পিলেকে। অনেক দিনের বিচ্ছেদের পর ডাক্তার পিলে বন্ধুর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। নতুন দিদিমা তুলসীর উপস্থিতির কথা জানতে পেরে তাকে তার স্নেহ-ভালোবাসার ক্রোড়ে চিরকালের জন্য টেনে নিতে চাইলে তুলসী তাতে অসম্মত হয়েছে। পিলেকে সে বলেছে – "সে আর হয় না রে পিলে" [২১] এরপর কাহিনিও সমাপ্ত হয়ে যায়। 'অচিন রাগিনী' উপন্যাসের বন্ধুত্বে হৃদয় গভীরতার ছবি থাকলেও, উভয়ের মধ্যেকার পারস্পরিক কথাবার্তা বা চিন্তাভাবনায় মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে নতুন দিদিমা। এমনকি তুলসী ও পিলে পরস্পর বন্ধু হলেও, পারস্পরিক প্রভাব উভয়ের জীবনে কম দেখা যায়। বরং নতুন দিদিমার প্রভাবই তাদের জীবনে বেশি। এই উপন্যাসের পিলে-তুলসীর সম্পর্ক শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথের কথা মনে করায়। শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথের মতো এখানে পিলে-তুলসী কিশোর বন্ধু। তুলসীর মধ্যে ইন্দ্রনাথ চরিত্রের ছায়া কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্রনাথের মতো সেও সাহসী, বেপরোয়া, পরিবার সংযোগহীন, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর। সে সর্বসমক্ষে নেশা করে, ছোঁয়াছুঁয়ি, জাতবিচার তার ইন্দ্রনাথের মতোই কম। ইন্দ্রনাথের মতো তুলসীর কিছু সংস্কারের উপর সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা আছে। রামনাম করলে ভূত পালিয়ে যায়, কাছে আসতে পারে না, তা ইন্দ্রনাথ জানে। আবার তুলসী জানে পঞ্জিকার মত অনুযায়ী আম্রপল্লবও ঠাকুর-দেবতার মত পবিত্র জিনিস। ও নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না। তাই সে তাকে ছুঁয়ে বন্ধু পিলেকে নিয়ে জীবনে কোনোদিন বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অপরদিকে পিলে তার তুলনায় অনেকটা শান্ত, ধীর, স্থির, সংযমী চরিত্র, অনেকটা শ্রীকান্তের মতো। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত, উভয়ে প্রশ্রয় পেয়েছিল অন্নদা

দিদির স্নেহের আঁচলে। আর এখানে পিলে-তুলসী আশ্রয় পেয়েছে নতুন দিদিমার স্নেহবন্ধনে। ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্তের মতো পিলে-তুলসী খেলাধুলা, দুষ্টুমি, কাউকে জব্দ করা, চুরি করা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থেকেছে। আবার ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্ত সম্পর্ক থেকে পিলে-তুলসীর সম্পর্কের পার্থক্যও আছে। প্রথম পার্থক্য প্রভাবগত ক্ষেত্রে। শ্রীকান্তের উপর ইন্দ্রনাথের যে প্রভাব ছিল, শ্রীকান্ত তা স্বীকার করেছিল। কিন্তু পিলের মনে তুলসীর স্থান খুব উঁচুতে হলেও তুলসীর কোনো প্রভাব পিলের জীবনে দেখা যায়নি। বা অন্যভাবে পিলের প্রভাব তুলসীর উপর দেখা যায়নি। ইন্দ্রনাথ বেপরোয়া, সাহসী, পরিবার সংযোগহীন হলেও সে শ্রীকান্তকে গভীরভাবে ভালোবাসত। এখানে পিলের প্রতি তুলসীর ভালোবাসা ইন্দ্রনাথ অপেক্ষা প্রবল নয়। এছাড়া 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ কাহিনির মধ্যে আচমকা উধাও হয়ে গিয়েছিল, 'অচিন রাগিনী'তে তুলসী কাহিনির শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। মাঝে পিলের সঙ্গে সাময়িক যোগাযোগ বিচ্ছেদ ঘটলেও পরে তার আবির্ভাব ঘটেছে, সেই সঙ্গে সম্পর্কের। তবে 'অচিন রাগিনী' তে উপসংহারে বন্ধুত্বে পুনরায় দেখা গেছে হৃদ্যতা, ভালোবাসা। অসুস্থ তুলসীর খবর জানতে পেয়ে পিলে তার শৈশব বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুল হয়েছে। আর তুলসী দীর্ঘদিন পর তাকে কাছে পেয়ে আনন্দিত হয়েছে। সুতরাং কাহিনির শেষে উভয়ের এই আকর্ষণ বিশেষ অনুভূতিদায়ক। তবে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মতো এখানেও বন্ধুত্বের শেষ পরিণতি কোনো সুখকর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়নি। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ অকস্মাৎ বিদায় নিয়েছিল। 'অচিন রাগিনী'তে দিদিমা তুলসীর খবর জানতে পারলে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে তুলসী রাজী হয়নি। পিলে তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেনি। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সংযোগ ছিন্নের আভাস পরিলক্ষিত হয়েছে। এই উপন্যাসের সমস্ত কাহিনি জুড়ে দিদিমাকে নিয়ে দুই বন্ধুর ক্রিয়াকলাপ যত বেশি আকর্ষণীয়, হৃদয়স্পর্শী উপসংহারে দুই বন্ধুর সংযোগছিন্নের দৃশ্যপট ততটাই করুণ বা বেদনাদায়ক। উভয়ের আকর্ষণের মাত্রাটিও স্থির নয়।

আশাপূর্ণা দেবীর 'অতিক্রান্ত' উপন্যাস দুই বন্ধুর মাঝে নারীর উপস্থিতিতে সম্পর্কের টানাপোড়েনের উপন্যাস। উপন্যাসটির মূল চরিত্র তিনটি। সন্তোষ, পরাশর এবং

সন্তোষের স্ত্রী শকুন্তলা। আশাপূর্ণা এই উপন্যাসে বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিশেষ কোনো নতুন পথে গমন করেননি। দুই বন্ধুর মাঝে এক নারীকে নিয়ে এসে মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সম্পর্কের পরিণতি সাধন করেছেন। উনিশ শতকে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাস বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' বা শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে'র মতো 'অতিক্রান্ত' উপন্যাসে প্রায় একই বিষয় দেখা গেছে অর্থাৎ দুই বন্ধু এবং মাঝে নারী - এই রকম একটি বিষয়কে নিয়ে নতুন ভাবনার দৃষ্টিকোণে তিনি যাত্রা করেছিলেন। বন্ধুত্ব এবং প্রেম এই সম্পর্ক দুটির মধ্যে পারস্পরিক নৈকট্যতা বাংলা উপন্যাসে পূর্বে লক্ষ্য করা গেছে। এদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত প্রচুর। একটি সম্পর্কের গভীরতায় অপর সম্পর্কের দোদুল্যমান অবস্থার চিত্র বা ভাঙনের মতো পরিস্থিতিও ঘটেছে বহুবার। আশাপূর্ণা 'অতিক্রান্ত' উপন্যাসে প্রেম এবং বন্ধুত্ব, এই দুই সম্পর্কের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে তার একটা ভিন্ন চিত্র অঙ্কনের চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন। সন্তোষ এবং তার পত্নী শকুন্তলার দাম্পত্য জীবনে বন্ধু পরাশরের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে লেখিকা একাধারে বন্ধুত্ব অন্যদিকে উদ্যম প্রেম আকর্ষণের রূপটিকে কাহিনিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে বন্ধুত্ব এবং প্রেমের মধ্যে যে জটিল লড়াইয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তাতে লেখিকা এখানে জয়ী করেছেন বন্ধুত্বকে। এখানে একদিকে যেমন নারীর কামনার দুর্দমনীয় রূপ প্রতিফলিত, তেমনি এর পাশাপাশি ফুটে উঠেছে বন্ধুত্বের এক পবিত্র, মহত্তর রূপ। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে ফুটে উঠেছে সামাজিক বিভিন্ন সম্পর্কের চিরন্তন রূপ। সামাজিক মানুষ, মানবিক সম্পর্কের গতি, তাদের বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনচিত্র প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম দিককার 'মিত্তির বাড়ী', 'শশীবাবুর সংসার', 'কল্যাণী' বা পরবর্তীকালের 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা' প্রভৃতি উপন্যাস তার পরিচয় বহন করে। 'অতিক্রান্ত' উপন্যাসেও মানব সম্পর্কের বৈচিত্র্যময় রূপ প্রতিফলিত। প্রেম, বন্ধুত্ব, দাম্পত্য প্রভৃতি সাংসারিক জীবনের সচল সম্পর্কের ছবি এর মধ্যে চিত্রিত। এখানে সম্পর্করূপে বন্ধুত্বের সগৌরব উপস্থিতি ঘটেছে।

'অতিক্রান্ত' উপন্যাসের মূল বিষয় হল পারিবারিক বা সাংসারিক জীবনে বহিরাগত পুরুষের আগমনে তার প্রতি নারীর হৃদয়জ আকর্ষণের প্রকাশ। সন্তোষ যখন পিতা-মাতাকে ছেড়ে শিশুপুত্র বিলু এবং স্ত্রী শকুন্তলাকে নিয়ে কলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করেছিল, তখন সেখানে ঘটে সন্তোষবন্ধু পরাশরের উপস্থিতি। তারপর সেখানে পরাশরের থাকা এবং আস্তে-আস্তে তার প্রতি শকুন্তলার হৃদয়জ প্রেম প্রদর্শন করা প্রভৃতি এই উপন্যাসের মূল বিষয়। লেখিকার এরকম একটি বিষয়গ্রহণ যে কোনো নতুনত্বের পরিচয় বহন করে না এ কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু এটি আসল কথা নয় কাহিনিতে পরাশর বন্ধুপত্নীকে সম্পূর্ণরূপে পাবার বা ভোগ করার সুযোগ পেলেও বন্ধুত্বের গভীরতায় বা মূল্যবোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে সে এই পথ থেকে দূরে সরে যায় এবং বন্ধুপত্নীকে পুনরায় স্বামীর কাছে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয় এটিই আসল কথা। বন্ধুত্বের দিক দিয়ে এই উপন্যাস এক মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত। যার প্রতিফলন ঘটেছে পরাশরের দিক দিয়ে। তবে উপন্যাসটি কোনো দুই বন্ধুর পারস্পরিক সম্পর্কের ছবি নয়। শকুন্তলা এবং পরাশরের মধ্যে আলাপ এবং তা থেকে প্রেমজ আকর্ষণের কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার চিত্রটি কাহিনিতে বেশি প্রবাহিত। আর এই বিষয়ের উপর গড়ে উঠেছে বন্ধুত্বের প্রকৃত প্রবাহ পথটি। সামাজিক জীবনে কামনা - বাসনা বা লালসার চেয়ে সুস্থ সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধনই যে অনেকক্ষেত্রে আমাদের কাম্য হয়ে থাকে, লেখিকা এখানে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। পরাশরের কাছে শকুন্তলার শরীরভোগের চেয়ে বেশি কাম্য হয়েছে বন্ধুর প্রতি কর্তব্যবোধ বা বিশ্বাস রক্ষার বিষয়টি। সামাজিক সম্পর্কের চিরাচরিত মূল্যবোধকে ভুলে গিয়ে সেখানে একটি অপবিত্র মলিন আবহ সৃষ্টি করার চেয়ে পবিত্র সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষাই মানবের আসল ধর্ম হওয়া উচিত, লেখিকা 'অতিক্রান্ত' উপন্যাসে সেটা দেখিয়েছেন। সেদিক দিয়ে উপন্যাসটির স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই স্বীকার্য। এখানে চরিত্র রূপে, বন্ধু রূপে পরাশর অত্যন্ত মহিমময়। আবার শকুন্তলাও নারী রূপে অনেকখানি

নিচে নেমে গেছে। এই রকম দুই চরিত্রের বিবর্তনে কাহিনিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সম্পর্কের মূল্যবোধ রক্ষার বিষয়টি।

'অতিক্রান্ত' উপন্যাসটি বন্ধুত্বের দিক দিয়ে এক বৃহৎ পরীক্ষাও বটে। লেখিকা এখানে দুই বন্ধুকেই কঠোর পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। একজনের বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস, আস্থা রাখার পরীক্ষা, আর অপরজনের বন্ধুত্বের চিরাচরিত মূল্যবোধকে জিইয়ে রাখার পরীক্ষা। প্রথমটির আধার হলেন সন্তোষ আর দ্বিতীয়টির পরাশর। সন্তোষের পীড়াপীড়িতেই পরাশর তার বাড়িতে থাকতে রাজী হয়েছিল। এরপর শকুন্তলার আকর্ষণকে বুঝতে পেরে পরাশর অকপটে সেই কথা স্বীকার করে বাড়ি থেকে যখন বিদায় নিতে চেয়েছিল, তখন সন্তোষ রাজি হয়নি। সন্তোষ বন্ধুকে আঘাত বা দোষারোপ করেনি। বরং সেই সময় তার মনোভাব লেখিকার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির প্রাচুর্যে বর্ণিত হয়েছে – "নির্বাক সন্তোষ ওর একটা হাত চেপে ধরে। সেই নিবিড় স্পর্শের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় বন্ধুর প্রতি বন্ধুর প্রীতি ও বিশ্বাস। পরাশরের উপর ওর বিদ্বেষ, বিরক্তি নেই, অবিশ্বাসও নেই। শুধু পরাজয়ের গ্লানি ভারাক্রান্ত মনের মধ্যে নিজের উপর রয়েছে একটা ধূসর ধিক্কার।" [২২] সুতরাং সন্তোষের কাছে এ একটা পরীক্ষা আর সে পরীক্ষায় হয়েছে সে জয়ী। আবার পরাশরের দিক দিয়ে বন্ধুর প্রতি কর্তব্যবোধ, বিশ্বাস রক্ষার যে পরীক্ষা ছিল, সেখানেও সে হয়েছে সসম্মানে উত্তীর্ণ। পরাশর নিজে বন্ধুপত্নীর প্রতি তার আকর্ষণ সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন। কিন্তু মনের অভ্যন্তর থেকে নিঃসৃত হয়নি কোনো কামনা-বাসনার স্রোত। সে বন্ধুর নির্মল হাসিটুকু মুছে দিয়েছে তা বুঝতে পারে। এরপরে তার কামনা-বাসনার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস রক্ষার দিকটি। এই উপন্যাসে সন্তোষ অপেক্ষা পরাশরের উপর বন্ধুত্ব পরীক্ষার ভারটি বেশি, যার চরম রূপ প্রত্যক্ষ করা গেছে শকুন্তলার তার সঙ্গে চলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। সন্তোষের সঙ্গে সম্পর্ককে অস্বীকার করে শকুন্তলা যখন পরাশরের প্রতি পরিস্কারভাবে প্রেম নিবেদন করে তার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তখনই পরাশরের সামনে এসেছে বন্ধুত্বের আসল

পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষায় পরাশর শেষ পর্যন্ত জয়ী করেছেন বন্ধুত্বকেই। সে শকুন্তলাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে ভোগ করার জন্য নয়, সন্তোষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। আর এখানে প্রতিফলিত হয়েছে বন্ধুত্বের জয়। 'অতিক্রান্ত' উপন্যাসে এইভাবে লেখিকা এক নারীকে সামনে রেখে বন্ধুত্বের এক মহত্তর রূপের ছবি দেখাতে চেয়েছিলেন পূর্বেকার কিছু উপন্যাসে বন্ধুপত্নীকে দখল করার গতানুগতিক দৃশ্য না দেখিয়ে। এই কারণে 'অতিক্রান্ত' উপন্যাসের বন্ধুত্ব বিশেষ এক মূল্যবোধের পরিচায়ক এবং স্বতন্ত্র।

বিশ শতকের প্রথমদিকে কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকের কিছু উপন্যাসে বন্ধুত্বের প্রবেশ ঘটেছিল। কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কোষ্ঠীর ফলাফল', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হের-ফের' প্রভৃতি উপন্যাসে বন্ধুত্ব একটি বলিষ্ঠ সম্পর্ক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কোষ্ঠীর ফলাফল' উপন্যাসে মানব-আজিজের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের এক চিরন্তন মূল্যবোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এরা কেউ বাল্যবন্ধু নয়, অথচ হৃদয়ের গভীরতায় একে অপরকে আপন করে নিয়েছিল। কাহিনির অল্প অংশে এদের বন্ধুত্বে লেখক এক পবিত্র আদর্শকে তুলে ধরেছেন। বন্ধুত্ব করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট দেশ, কাল বা সীমানার প্রয়োজন হয় না। এখানে মানব ও আজিজ এই ধারণাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হের-ফের' উপন্যাসেও রজত ও শিশিরের বন্ধুত্ব লক্ষ্য করা গেছে। তবে উভয়ের সম্পর্কে এক সময় প্রবৃত্তি প্রবেশ করে সম্পর্কটিকে এলোমেলো, অস্থির করে দিয়েছে। কাহিনিতে রজত এবং শিশির প্রধান চরিত্র। স্বাভাবিকভাবে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগও ঘটেছে বেশি। এখানে সম্পর্ক রূপে বন্ধুত্বের গুরুত্ব কম নয়। চরিত্র এবং সম্পর্কের ক্রিয়াকলাপে বাস্তব আবহ লক্ষ্য করা যায়।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' বা তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' ছাড়া বাংলা সাহিত্যের আরো কিছু আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে বন্ধুত্বের ছায়া লক্ষ্য করা গেছে। যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' বা রমাপদ চৌধুরীর 'প্রথম প্রহর'-এর মতো আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসেও বন্ধুত্বের ক্ষীণরেখা ফুটে উঠেছে। 'অপরাজিত' উপন্যাসের নায়ক অপুর জীবনে বা 'প্রথম প্রহর'-এর নায়ক তিমুর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বেশ কিছু বন্ধু। 'অপরাজিত'তে অপুর বন্ধু হিসেবে উঠে এসেছে প্রণব, অনিল, মন্মথ, হরেন প্রভৃতি চরিত্র, যাদের সঙ্গে অপুর সম্পর্ক ছিল গভীর। কাহিনিতে খুব অল্প সময়ের জন্য এদের পারস্পরিক সম্পর্কের রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে। বৈচিত্র্যময় অপুর জীবনের কেন্দ্রে এই চরিত্রগুলি হঠাৎ করে উঠে এসে বন্ধুত্বের উপস্থিতিকে তুলে ধরেছে। কিন্তু বৃহৎ উপন্যাসে বন্ধুত্বের পরিধি বৃহৎ নয়। রমাপদ চৌধুরীর 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসেও নায়ক তিমুর জীবনে কিছু বন্ধুর আবির্ভাব দেখা যায়, যার সঙ্গে লেখকের নিজের বাস্তব বন্ধুর মিল আছে। এখানেও লেখকের বাস্তব জীবনের কিছু বন্ধু উপন্যাসে উঠে এসেছে। তিমুর জীবনে মুস্তাফা প্রমুখ দু-এক জন বন্ধু ছিল, যাদের বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। তবে 'প্রথম প্রহরে' বন্ধুত্বের প্রসার বিশেষ নেই, গভীরতা আছে।

তথ্যসূত্র

১। বনফুলের জীবন ও সাহিত্য, ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক- বর্ণালী, প্রকাশকাল- ১৯শে জুলাই ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৭৯

২। বনফুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক- গ্রন্থালয় প্রাঃলিঃ, তৃতীয় মুদ্রণ- ২রা মাঘ ১৪০৩, ১৬ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ৪২৩

৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২৪

৪। কথাকোবিদ বনফুল, ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক- বর্ণালী, প্রকাশকাল- ২৫শে বৈশাখ ১৩৯৬, মে ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ৯০

৫। মানিক সাহিত্য সমীক্ষা, নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত, প্রকাশক- পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৮১, পৃষ্ঠা- ২৫

৬। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা, ড. নিতাই বসু, পরিবেশক- দে বুক স্টোর, প্রথম প্রকাশ - ২৩শে ফাল্গুন ১৩৮৪, ৭ই মার্চ ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ১৫

৭। বিবাহের চেয়ে বড় (অচিন্ত্য গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রকাশক- আনন্দধারা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ - পৌষ ১৩৭৫, ডিসেম্বর ১৯৬৮, পৃষ্ঠা- ৩৪৮

৮। চালচলন, (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, নবম খণ্ড), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ২০০১, পৃষ্ঠা- ১৯১

৯। শহর বাসের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক - তুলিকলম, নতুন মুদ্রণ- বৈশাখ ১৩৭৯, এপ্রিল ১৯৭২, পৃষ্ঠা-৬৫

১০। দর্পণ (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংশোধিত মুদ্রণ- জুন ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৪৩৪

১১। মাশুল (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, দশম খণ্ড), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা- ৪১২

১২। দর্পণ (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ- ৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংশোধিত মুদ্রণ- জুন ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৪২৯

১৩। সোনার চেয়ে দামী (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, সপ্তম খণ্ড), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক - পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০০০, পৃষ্ঠা- ২৫৮

১৪। এক বাড়িতে (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, নবম খণ্ড), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ২০০১, পৃষ্ঠা- ৭৫

১৫। পুতুলনাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, চতুস্ত্রিংশ মুদ্রণ- জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, পৃষ্ঠা- ৯৬

১৬। অহিংসা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ- আগস্ট ২০০০, পৃষ্ঠা- ৩১৪

১৭। জীয়ন্ত (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা- ৪৩৬

১৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক- মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃলিঃ, পুনর্মুদ্রণ- ২০০১, পৃষ্ঠা- ৫০৩

১৯। জীবনায়ন, মণীন্দ্রলাল বসু, প্রকাশক- ডি এম লাইব্রেরি, দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৩৫৮, পৃষ্ঠা- ৯৭

২০। অচীন রাগিনী, সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রকাশক- বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রকাশকাল- ১৩৬১ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ, পৃষ্ঠা- ১

২১। তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৬

২২। অতিক্রান্ত, আশাপূর্ণা দেবী, অনামিকা পাবলিশার্স, প্রকাশকাল- অগ্রহায়ণ ১৪০২, পৃষ্ঠা- ১১৮